লোক প্রশাসন সাময়িকী
ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুন ৯৯, আষাঢ় ১৪০৬

বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠ পর্যায়ে জন প্রশাসন প্রসঙ্গ

ডঃ তোফায়েল আহমেদ *

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধ্রুপদী সূত্র অনুসারে চারটি পরস্পর নির্ভরশীল উপাদান যথা নির্দিষ্ট ভূখন্ড, একটি জনগোষ্ঠি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্র নামক সংগঠন। এ চারটি উপাদানের মধ্যে ভূখন্ড ও সার্বভৌমত্বের ধারণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও এই দুইটি উপাদান নিজস্ব মহিমায় রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালনায় কখনও সক্রিয় হতে পারে না। জনগণ ও সরকার এই দুইটিই মূলতঃ রাষ্ট্রের সক্রিয় উপাদান বা মূল চালিকা শক্তি। রাষ্ট্রের প্রকাশ ও বিকাশ এই দুই উপাদানকে ঘিরেই গড়ে উঠে এবং প্রসারিত হয়ে থাকে।

রাষ্ট্র মূলতঃ একটি বিমূর্ত ধারণা। জনগণ ও সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্র ধারণা নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি পায় এবং লাভ করে একটি বিশিষ্ট চরিত্র।[১] সে চরিত্র স্থান কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন রকম বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত হয়ে রাজতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, কল্যাণমূলক প্রভৃতি নামে পরিচিতি পায়। সরকারই রাষ্ট্রের মূখপাত্র হিসাবে কাজ করে এবং সার্বক্ষণিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে একটি প্রশাসনিক বা নির্বাহী কাঠামো সৃষ্টি করে। তাই সরকার ও প্রশাসনকে এক কথায় রাষ্ট্রযন্ত্র (Apparatus or machinery of the state) বলা হয়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড জীবন্ত হয়ে উঠে। রাষ্ট্রের এই রূপ ভয়ংকর এবং কল্যাণকর দুই রকমই হতে পারে। যেমন নিরঙ্কুশ ও বংশানুক্রমিক রাষ্ট্র, একাত্মবাদী ও সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার রাষ্ট্র, স্বার্থান্ধ সামন্ত বা বুর্জোয়াদের একক কব্জায় পরিচালিত রাষ্ট্র এবং বিশেষ কোন একক শ্রেণী বা শ্রেণীগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষাকারী প্রভৃতি চরিত্রের রাষ্ট্র সামগ্রিক জনকল্যাণের সহায়ক হয় না। তারা ভয়ানক ও ভয়ংকরভাবে জনবিরোধী হতে পারে। আবার কখনও কখনও তাদের অধীনে জন শোষণ প্রক্রিয়া সহনীয় পর্যায়েও থাকতে পারে। কিন্তু শোষণ, নিপীড়ন, দলন, স্খলন যে থাকবে তা এক রকম অবধারিত। এ জাতীয়

---

* লেখক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রাকার পানি উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্শক সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে কর্মরত।

কাঠামোর অধীনে সাধারণ জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে অবরুদ্ধ থাকে। আবার বিপরীতক্রমে গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমূলক ধারায়ও রাষ্ট্রের বিকাশ হতে পারে। যতই দিন যাচ্ছে সভ্যতা ততই অগ্রসর হচ্ছে। রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিকাশে কল্যাণমূলক দিক প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। যেখানে সমাজের সকল পেশা, শ্রেণী, বর্ণ, কর্ম, ধর্ম, লিঙ্গ, নির্বিশেষে সবার আনুপাতিক অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে, রাষ্ট্রের গণমুখী চরিত্র সেখানে অধিক বিকাশের সুযোগ পায়। তাই জনগণের অংশগ্রহণ ও জনজবাবদিহিতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের গণমুখিতা নির্ণিত হয়। আজকাল আধুনিক রাষ্ট্রীয় বিকাশের প্রবণতা গণতন্ত্র ও কল্যাণমুখী। তবে সর্বক্ষেত্রে এ বিকাশ বাধামুক্ত নয়। তাই কল্যাণমুখী রাষ্ট্রীয় বিকাশের লক্ষ্যে চলছে নিরন্তর পরিবর্তন ও প্রগতির সংগ্রাম এবং আন্দোলন। জনপ্রশাসন তথা রাষ্ট্র যন্ত্রের সংস্কার প্রচেষ্টাকেও সে সংগ্রাম এবং আন্দোলনের অংশ হিসাবে ধরে নেয়া যায়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র যন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ একটি বিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র যন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশিষ্ট কিছু মতবাদ প্রচলিত আছে।[২] তা ছাড়া প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্রের রয়েছে সুনির্দিষ্ট সামাজিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপাদান যা পরবর্তীতে সে সমাজে রাষ্ট্র গঠন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিকাশের পিছনে অবদান যুগিয়েছে।

এখানে এ প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় মতবাদসমূহ বা বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনার অবকাশ নেই। তবে জন প্রশাসন সংস্কারের মত বিষয়ের আলোচনায় ইতিহাসবিমুখতা আলোচনাকে মূল বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। তাই জন প্রশাসনের আলোচনায় ঐতিহাসিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃহত্তর ঐতিহাসিক পরিসর বিবেচনা করলে বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় রাষ্ট্র গঠন অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা।[৩] কিন্তু একটি বিশিষ্ট সামাজিক সত্তা, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি হিসাবে বাঙালী একটি সুপ্রাচীন সমাজ ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী।[৪] তাই সাম্প্রতিক কালের রাষ্ট্রগঠন ও রাষ্ট্রযন্ত্র সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার অংশ হিসাবেই বিবেচিত হওয়াই সঙ্গত।

বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয় ১৯৭১সালে। কিন্তু এ স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পূর্ববর্তী অন্ততঃ আড়াই হাজার বছর যাবত এ ভূখন্ডে বিভিন্ন আদল ও চরিত্রে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল।[৫] সে রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজস্ব রূপ ও চরিত্র অনুযায়ী এখানে রাষ্ট্রযন্ত্র বা সরকার ও প্রশাসনকে তৈরী করেছে। ১৯৭০ এর পূর্ব পর্যন্ত আড়াই হাজার বছরের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে কম বেশী ৫০০ থেকে ৭০০ বছর স্বাধীন রাজা ও

সুলতানদের অধীনে বাংলা শাসিত হয়।[৬] ইংরেজ ও পাকিস্তান যুগ বাদে বাকী সময় মূলতঃ একটি দূরবর্তী রাষ্ট্রের প্রান্তিক পর্যায়ের প্রদেশ হিসাবে বাংলাকে গণ্য করা হতো। ইংরেজ ও পাকিস্তান আমলে সে অবস্থার পরিবর্তন হলেও বাংলা এই দুই আমলেও একটি প্রদেশের মর্যাদাতেই শাসিত হয়েছে। তাই এদেশের রাষ্ট্র ও প্রশাসনের আধুনিক কাঠামো মূলতঃ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার। ঔপনিবেশিক ধারার যুক্তরাষ্টীয় সরকারের অধীনস্থ একটি প্রাদেশিক পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোকে পরবর্তীতে স্বাধীন এককেন্দ্রিক দেশের প্রশাসনিক কাঠামো হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাই এখানে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কারের অনেক বিষয় রয়েছে যা হয়ত একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হবার দাবী রাখে।

স্বাধীনতার পর থেকে (১৯৭১ সনের পর) রাষ্ট্র যন্ত্রকে সংস্কারের উদ্দেশ্যে অনেকগুলো কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে।[৭] কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কমিটি বা কমিশনের প্রতিবেদনসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সরকারসমূহের কাছ থেকে যথাযথ মনোযোগ পায়নি। সাম্প্রতিককালে জাতীয় সরকারসমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, বিশ্ব ব্যাংক, যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সাহায্যসংস্থা (ইউ, এস এইউ) প্রভৃতি সংস্থাও বিভিন্ন গবেষণা কর্মের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশাসনিক সংস্কারের তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে।[৮] কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কি আন্তর্জাতিক সাহায্যের বিভিন্ন শর্তের মধ্যে প্রশাসনিক সংস্কারকে অন্যতম একটি শর্ত হিসাবে আরোপ করা হচ্ছে।[৯] ১৯৯৭ সনের অক্টোবর মাসে সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেশে সর্বশেষ একটি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে এবং এই কমিশন একজন অতি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন চেয়ারম্যান (পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদায়) এবং একজন সদস্য সচিবসহ তিন জন পূর্ণকালীন সদস্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে। তা ছাড়া রয়েছেন আরও নয়জন পদাধিকার বলে নিযুক্ত সরকারী সদস্য। এই কমিশন ৯টি কার্যপরিধির (Terms of Reference) আওতায় কাজ করছে।[১০] বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার আওতায় কমিশনের কর্মপরিধির শুধুমাত্র একটি কার্যপরিধি প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্য দুটি কার্যপরিধি আংশিকভাবে সম্পর্কিত। ঐ কমিশনের কর্মপরিধির সংশ্লিষ্ট অংশ ক্রমিক নং অনুযায়ী নিম্নরূপ ঃ

(ঘ) সরকারী কর্মকান্ডের বিকেন্দ্রীকরণ ও ডিভলিউশন (Devolution) এর উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইনের সহিত সংগতি রাখিয়া সকল সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের জন্য সুপারিশ করা।

চ) মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং অন্যান্য সকল সরকারী অফিস এবং আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল পুনর্বিন্যাস, যুক্তিযুক্তকরণ, সংকোচন ও যুক্তিসংগতভাবে পুনর্গঠন করার বিষয়ে সুপারিশ করা।

ঝ) উপরি উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আইনগত বিধিগত প্রক্রিয়াসহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং উহাদের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণার্থে সুপারিশ করা।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠপর্যায়ের প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গ অবতারণায় বর্তমান প্রবন্ধকে সংক্ষিপ্ত কিছু পৃথক অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠ প্রশাসনের একটি সংক্ষিপ্ত তত্ত্বীয় আলোচনা উপস্থাপন করার পর দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশ ভূখন্ডে মাঠ প্রশাসনের ধারণার ঐতিহাসিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তৃতীয় অংশে বাংলাদেশে রাষ্ট্র গঠিত হবার পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের মাঠ প্রশাসন সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনার পর চতুর্থ অংশে বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় শাসন ও মাঠ প্রশাসন প্রসঙ্গের অবস্থা, অবস্থান ও সংস্কারের সুপারিশসমূহ স্থান পেয়েছে।

এক. বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠ প্রশাসন ঃ তত্ত্বীয় আলোচনা

১.১ বিকেন্দ্রীকরণ

বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনিক পরিভাষায় বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। শব্দগত অর্থে এটি অত্যন্ত সহজ এবং ঢালাওভাবে ব্যবহৃত হলেও তত্ত্বগত দিকটি তত সহজ নয়। কারণ ধারণাগতভাবে বিকেন্দ্রীকরণ রাজনীতি, প্রশাসন ও অর্থনীতির কিছু জটিল সূত্রের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। সাধারণ সংজ্ঞায় সরকারের উচ্চ পর্যায়ে থেকে নিম্নপর্যায়ে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের স্থানান্তরকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয় তবে এক্ষেত্রে এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের হস্তান্তর বা স্থানান্তর মূলতঃ দুটি প্রধান ক্ষেত্রে হতে পারে। প্রথমতঃ ভৌগোলিক বিভাজনে (Territorial Decentralization) কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায়ে যেমন বিভাগ, জেলা, থানা, ইউনিয়ন, গ্রাম প্রভৃতি প্রশাসনিক বিভিন্ন এককসমূহে ক্ষমতা দান; দ্বিতীয়ত কার্যক্রম ভিত্তিক পেশাদারিত্বের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি (Functional Decentralization) যেমন, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রকৌশল প্রভৃতি কার্যক্রমের জন্যে পৃথক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে কর্তৃত্ব গ্রহণ ও বন্টন।

১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে ডান, বাম, উদারনৈতিক, র‍্যাডিক্যাল প্রায় সকল মতের অনুসারীগণই নিজ নিজ তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধারণার প্রয়োগে উৎসাহ দেখাতে থাকেন। বিশেষ করে বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়ন প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। সনাতনী বামপন্থী ও নব্যবামপন্থী নির্বিশেষে সকল বামপন্থী রাজনীতিকগণ স্থানীয় গণতন্ত্র, কমসুবিধাভোগীদের মধ্যে পৌরসেবা সম্প্রসারণ, স্থানীয় রাষ্ট্রের চরিত্র বদল ইত্যাদির সাথে বিকেন্দ্রীকরণকে একটি আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যায়। স্থানীয় নির্বাচনেও বামপন্থীদের ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায়। তারা বৃটিশ হোয়াইট হাউজ দখলের পূর্ব প্রক্রিয়া হিসাবে টাউন হল দখলের কৌশলের কথা প্রচার করতে থাকেন।[১১] অপর দিকে সনাতনী ডান ও বাজারপন্থীগণও বিকেন্দ্রীকরণের নবতর ব্যাখ্যা হাজির করতে থাকেন। তারা উন্মুক্ত বাজারনীতি, জনগণকে যাচাই-বাছাই করার আরও ক্ষমতা দান, অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ ও হস্তক্ষেপ শিথিলকরণ, বি-আমলাতান্ত্রিকীকরণ, বিরাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদির সাথে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাকে যুক্ত করে দেয়। এভাবে বিকেন্দ্রীকরণ ধারণা বা তত্ত্ব হিসাবে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক গন্ডীর বাইরে বৃহত্তর সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

বর্তমান সময়ে বিকেন্দ্রীকরণকে তাই কোন একটি বিশেষ সংগঠনের ক্ষমতা কর্তৃত্বের প্রবাহ প্রক্রিয়ার সাথে খন্ডিতভাবে না দেখে সামগ্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি নিরন্তর ও চলমান প্রক্রিয়া হিসাবেই দেখা হয়। বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে সহজভাবে উপলব্ধির জন্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ এর সকল প্রকার ও পদ্ধতিগুলোকে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মাওহুদ, ছীমা ও রনডিনেলী ও আপহফ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[১২] মাওহুদ এই ধারণাকে বিপুঞ্জীভূতকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। ছীমা ও রনডিনেলী বিকেন্দ্রীকরণকে বিপুঞ্জীভূতকরণ (Deconcentration), অর্পণ (Devoluton), প্রত্যর্পণ (Delegetion) ও বিরাষ্ট্রীয়করণ (Privatisation) এই চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। আপহফ বিকেন্দ্রীকরণের শেষোক্ত ধারণা বিরাষ্ট্রীয়করণকে আরও তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করেন। যথা মধ্যস্থতাকরণ (Intermediation), সেবায়ন (philanthropisaion) এবং মুক্ত বাজার (Marketisation) ধারণাগুচ্ছের মাধ্যমে বিরাষ্ট্রীয়করণের ধারণাকে তিনি আরো অধিক সংহত করেছেন।

ক. বিপুঞ্জীভূতকরণ **(Deconcentration)**ঃ বিকেন্দ্রীকরণের বিপুঞ্জিভূতকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সরকারী বিভিন্ন বিভাগসমূহের

অভ্যন্তরের উচুঁ থেকে নীচু পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে স্থানান্তর বা হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়। প্রধানতঃ সরকারী বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কর্মকর্তাদের মধ্যে উপর থেকে নিচে হস্তান্তরই বিপুঞ্জীভূতকরণ।

খ. **অর্পণ (Devolution) ঃ** বিকেন্দ্রীকরণের নামে ক্ষমতা অর্পণ পদ্ধতি মূলতঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের হস্তান্তর। এ পদ্ধতির আওতায় জাতীয়ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রচলিত সংবিধানের আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বশীল সরকার কাঠামোর নিকট কিছু কিছু আইন, শাসন ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা অর্পণ করে থাকে। সাধারণত প্রাদেশিক সরকার এবং প্রদেশের নিম্নবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকারসমূহে ক্ষমতা অর্পণ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিপুঞ্জীভূতকরণের পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের অভ্যন্তরে নির্বাহী আদেশ বলে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। আর অর্পণ পদ্ধতির অধীনে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তথা আইন বিভাগের বা আইন অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ অন্য একটি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করে থাকে। যেমন পার্লামেন্ট বা সংসদ আইন পাশ করে কিন্তু রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম যে কোন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার সৃষ্টি ও তার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে। বিশেষতঃ সুনির্দিষ্টভাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকেই অর্পণ পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে devolition বা অর্পণ বাস্তবক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রায় সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে যায়। যুক্তরাজ্যের ওয়েলস্ ও স্কটল্যান্ডে স্বতন্ত্র পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সে দেশে ডিভলিউশন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ. **প্রত্যর্পণ (Delegation) ঃ** সাধারণ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতার প্রর্ত্যপণের (Delegation of Power) ধারণার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের আওতায় ক্ষমতার প্রত্যর্পণ মূলতঃ সংগঠনের অভ্যন্তরে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তার কাছে ক্ষমতা প্রত্যর্পণকে বুঝানো হয়। যেমন একটি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বোর্ড কিছু ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করতে পারেন। আবার ম্যানেজিং ডিরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার বা তৎপরবর্তীদের নিকট এমনকি

ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের নিকট কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করতে পারেন। কিন্তু ক্ষমতা প্রত্যর্পণের পরও সর্বশেষ জবাবদিহিতা প্রত্যর্পণকারী কর্মকর্তার উপরই বর্তায়। তাই ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতার প্রত্যর্পণ ও বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় প্রত্যর্পণ এক নয়। সরকারের সাধারণ মন্ত্রণালয় যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যখন কোন বিশেষায়িত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক বিশেষায়িত এজেন্সী বা সংস্থা গঠন করে এবং সে সংস্থাসমূহকে ঐ কার্যক্রমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে তখন তাকে বিকেন্দ্রীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যর্পণ বলা হয়। আমাদের দেশে মৎস্য, পশুসম্পদ, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা; প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন অধিদপ্তর, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা বিকেন্দ্রীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের দৃষ্টান্ত বহন করে।

ঘ. **বিরাষ্ট্রীয়করণ (Privatisation)** ঃ বিরাষ্ট্রীয়করণ বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্বের সমসাময়িক কালের সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের অধীনে সরকারের আকার আকৃতি ছোট করা এবং রাষ্ট্র শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণমূলক বা নিরাপত্তামূলক কাজসমূহ হাতে রেখে উন্নয়ন, ব্যবসায়িক ও অন্যান্য অর্থকরী কাজ বেসরকারী ও ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের কাছে হস্তান্তরের বিষয়টির উপর জোর দেয়। বলা হচ্ছে তাতে করে সরকার নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে তার জন্য নির্দিষ্ট কাজগুলো করতে পারবে। সরকারের আকার ও আয়তন বৃহৎ হওয়ার কারণে সরকার নিয়ন্ত্রণহীন ও অদক্ষ হয়ে পড়ছে। তাই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, ব্যবসা ও সেবা কার্যক্রমের অনেক কিছু ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর করার কথা ভাবা হচ্ছে। এমন কি উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্র ঋণ, তৃণমূল পর্যায়ে সাক্ষরতা প্রভৃতি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার হাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে বা সরকারী সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে বিরাষ্ট্রীয়করণের এই ধারণা একদিকে একটি আন্দোলন, অপরদিকে দাতাদের কাছ থেকে একটি শর্ত হিসাবে আরোপিত হচ্ছে। বিশেষতঃ মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠাকে সামনে রেখে বাণিজ্য উদারিকরণ, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আইন কানুন বিধিবিধানের নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ (Deregulation) প্রভৃতিকে বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বর্তমান প্রবন্ধে মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারকে জ্যোতিকেন্দ্রে রেখেই যেহেতু সকল আলোচনা, তাই জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কার্যপরিধিতে বিকেন্দ্রীকরণের শুধুমাত্র একটি পদ্ধতি ডিভলিউশনের উল্লেখ করা হলেও অন্যান্য তিনটি দিকও অবহেলার

অবকাশ নেই। কারণ বিভিন্ন সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষমতা কর্তৃত্বের বিন্যাসে বিপুঞ্জীভূতকরণ পদ্ধতি এবং তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম সংহত করার জন্যে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের (NGO) কার্যক্রম প্রসারের কথা চিন্তা করতে হলে সক্রিয়ভাবে বিরাষ্ট্রীকরণ পদ্ধতির প্রয়োগও যুগপৎ ভাবে করার প্রয়োজন দেখা দিবে। তাই দেখা যায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের জন্যে ডিভলিউশন যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তেমনি ডিভলিউশনকে প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্যে বিপুঞ্জীভূতকরণ ও বিরাষ্ট্রীকরণ পদ্ধতির উপরও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

১.২ মাঠ প্রশাসন তত্ত্ব

প্রত্যেকটি সমাজ ও রাষ্ট্রের নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, পরিবেশ, প্রয়োজন ইত্যাদির নিরিখে সে সমাজ ও রাষ্ট্রে রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মনীতি ও সংগঠন কাঠামো গড়ে উঠে। এক সময় জাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্র ছিল। গোত্র, দল, কৌম ও উপজাতীয় কাঠামো থেকে উপজাতি এভাবে ধীরে ধীরে একটি বৃহত্তর ভৌগোলিক কাঠামোতে রাষ্ট্র কাঠামোর অধিষ্ঠান। বহু জাতি, বহুভাষা, বহু ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি নিয়েও একটি আধুনিক একক রাষ্ট্র গঠিত হয়। তাই রাষ্ট্রের দর্শন, নিয়মনীতি ও প্রশাসনিক কাঠামোতে এই সব কিছুরই কিছু কিছু প্রতিফলন ঘটে থাকে।

এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মাঠ প্রশাসন ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে সে প্রশাসনের একটি সাধারণ শ্রেণীবদ্ধকরণ করা যায়। সর্বক্ষেত্রে তা প্রতিটি দেশের হুবহু চিত্র না হলেও একটি সাধারণ সূত্র আবিস্কার বা অনুধাবনে সে শ্রেণীবদ্ধকরণ কিছুটা সহায়ক হতে পারে। এ. এম. এম শওকত আলী, ব্রায়ান স্মীথ ও রবার্ট সি ফ্রাইড এই তিন জনের মাঠ প্রশাসন সংক্রান্ত তিনটি পুস্তকের সহায়তায় মরহুম এম, এ খানের নেতৃত্বে ১৯৮২ সনে গঠিত প্রশাসনিক পুর্নগঠন ও সংস্কার কমিটির প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণীতে মাঠ প্রশাসনকে বিভক্ত করা হয়েছেঃ [১২]

ক. বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতি (Decentralised system)

খ. ফ্যাংশানাল পদ্ধতি (Functional system)

গ. প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি (Prefectoral system)

ক. বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিঃ বৃটেনের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতির সার্থক উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণমূলক (Regulatory) কাজসমূহ হাতে রেখে বাকী বিভিন্ন কাজ ব্যুরো, সিটি এবং কাউন্টি কাউন্সিলগুলোর কাছে স্থানান্তর করা হয়। হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উপর কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ক্ষেত্রে পৃথক কোন সংস্থা সৃষ্টি করে না। তবে সেবাসমূহের যাতে একটি ন্যূনতম গুণগতমান রক্ষা পায় সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক হস্তক্ষেপ অনাকাঙ্ক্ষিত বা নজীরবিহীন নয়। কোথাও কোন কারণে সেবার গুণগতমান বিঘ্নিত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ আসতে পারে। বৃটেনে স্থানীয় সরকারগুলোতে কাউন্সিলারগণ দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। প্রায় সকল স্থানীয় কাউন্সিল কোন না কোন দল (লেবার, লিবারেল-ডেমোক্রেটিক, কন্জারভেটিড ও অন্যান্য স্থানীয় দল যথা স্কটিশ ন্যাশনাল, ওয়েলস ন্যাশনাল, সীনফেইন, আলষ্টার ইউনিয়নিষ্ট প্রভৃতি দল) এককভাবে বা কোয়লিশন করে নিয়ন্ত্রণ করে। বাকী কাউন্সিলগুলো নির্দলীয় ও দলীয় কাউন্সিলরদের মধ্যে কোয়লিশনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আমাদের দেশের ক্যারিয়ার সিভিল সার্ভেন্টের মত পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ক্যারিয়ার লোকাল কাউন্সিলার দেখা যায়। আমাদের দেশের মানুষ যেমন কোন স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্যে জেলা ও থানা ভিত্তিক স্থানীয় প্রশাসনের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত, ঐ সব দেশের মানুষ পুলিশ ও বিচার বিভাগের আওতায় না হলে ঐ একই বিষয়ের জন্যে সরাসরি স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর দিকে তাকাতে অভ্যস্ত।

খ. ফ্যাংশানাল পদ্ধতি ঃ ফ্যাংশানাল পদ্ধতির একটি আদর্শ উদাহরণ হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেকটি সংস্থা ও বিভাগের কাজকর্ম বিভাগীয় প্রধানের দপ্তরের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়। আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় মূলতঃ রাজনৈতিক প্রশাসনের অন্তর্গত। নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজগুলোয় সাধারণত ফেডারেল তথা কেন্দ্রীয়, ষ্টেট ও স্থানীয় এই তিন স্তরে দায়িত্ব ও ভূমিকার পরিস্কার বিভাজন রেখা রয়েছে। আমেরিকান ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান প্রধান পর্যায়ে বিশেষতঃ স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে মেয়র, ষ্টেট পর্যায়ে গভর্ণর এবং ফেডারেল পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট শেষ পর্যন্ত জবাবদিহি করে থাকেন। অবশ্য মেয়র, গভর্ণর ও রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণের কাছে যেমন জবাবদিহি করেন তেমনিভাবে তারা আবার স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নির্বাচিত কাউন্সিল, ষ্টেট সভা, প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের কাছেও তাদের কাজের জন্যে জবাবদিহি করেন। এই ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাতারাতি জন্ম নেয়নি। বহুদিনের ক্রমাগত ধারাবাহিকতায় এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ. প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি ঃ মাঠ প্রশাসনের শ্রেণীবদ্ধকরণে তৃতীয় প্রকার বা ধরনটিকে প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এ পদ্ধতির সনাতনী উদাহরণ ফ্রান্স। এ পদ্ধতির অধীনে সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া মার্কিন ব্যবস্থার বিপরীত। এখানে সকল সমন্বয়ই মূলতঃ প্রশাসনিক কর্মের অন্তর্ভুক্ত। প্রিফেক্টরাল পদ্ধতিকে আবার প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, সমন্বিত প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি (integrated prefactoral system ও অসমন্বিত প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি (Unitegrated prefactoral system)। এই সমন্বিত ও অসমন্বিত পদ্ধতির সীমারেখা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সাথে প্রিফেক্টের সম্পর্কের ভিত্তিকে প্রধান নির্ণায়ক হিসাবে গণ্য করা হয়। ফরাসী দেশে মেয়র থাকা সত্ত্বেও প্রিফেক্টকে স্থানীয়ভাবে সকল সরকারী কর্মচারীদের প্রধান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এমনকি প্রিফেক্টের অধীনস্থ সকল বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ প্রিফেক্টের মাধ্যমেই নিজ নিজ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। প্রিফেক্ট একাধারে প্রশাসনিক প্রধান এবং জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি। প্রিফেক্টের এই ভূমিকা ফরাসী সংবিধান স্বীকৃত।

ইটালীতে বিরাজিত প্রিফেক্টোরাল পদ্ধতিকে অসমন্বিত পদ্ধতির দৃষ্টান্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এখানে প্রিফেক্টকে স্থানীয় সরকারের প্রধান প্রশাসক হিসাবেও দেখা হয় না এবং স্থানীয় সরকারী বিভাগের কর্মকর্তাগণকে প্রিফেক্টের মাধ্যমে উচ্চপর্যায়ে তাদের স্ব স্ব বিভাগের সাথে যোগাযোগও করতে হয় না। কিন্তু প্রিফেক্টকে ইটালীতেও রাজনৈতিভাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে স্বীকার করা হয়।

স্থানীয় শাসন ও মাঠ প্রশাসনের সামগ্রিক ইতিহাস বিবেচনা করলে বাংলাদেশের জেলা প্রশাসনের উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে প্রিফেক্টরাল পদ্ধতির সাযুজ্য অনেক বেশী। বৃটিশ আমলের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর প্রিফেক্ট থেকেও শক্তিশালী ছিল। যদিও বৃটিশগণ নিজ দেশে বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছেন কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার সকল উপনিবেশ গুলোতে তারা মূলতঃ ফরাসী প্রিফেক্টোরাল পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। পরবর্তীতে ১৯২০ সালে জেলা পরিষদকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার প্রচেষ্টা হিসাবে নির্বাচিত জেলা পরিষদ সভাপতির পদসৃষ্টি করা হলেও এ ব্যবস্থা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।[১৪] ভারতে অবশ্য জেলা পরিষদ বরাবরই নির্বাচিত সভাপতি ও পরিষদের অধীনে পরিচলিত হয়ে আসছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ১৯৬০ সন থেকে ডেপুটি কমিশনার হিসাবে পরিচিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা, কাজ ও ভূমিকায় ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। প্রশাসনের সাধারণী ও বিশেষজ্ঞের দ্বন্দ্ব বিশেষতঃ ক্যাডার

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার সাময়িকী শাখা

ভিত্তিক আন্দোলনের কারণে ডেপুটি কমিশনারের জেলা পর্যায়ে সমন্বয়কারীর ভূমিকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আইনগতভাবে ডেপুটি কমিশনার জেলার পুলিশ প্রধান হলেও তার কার্যকারিতা বাস্তব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে নতুন উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী পূর্বতন থানাসমূহে উপজেলা পরিষদ গঠিত হবার পর ডেপুটি কমিশনার ও অন্যান্য জেলা পর্যায়ের বিভাগগুলোর ক্ষমতা আরও সীমিত হয়ে পড়েছে।

তাই ভবিষ্যতে জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রশাসন, সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসমন্বিত করার জন্যে মাঠ প্রশাসনের পুর্নবিন্যাসের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠ প্রশাসনের তত্ত্বীয় বিষয়গুলোর পর্যালোচনা অতীব জরুরী। সে সাথে বাংলাদেশে বর্তমানে বিরাজিত মাঠ প্রশাসন কাঠামোর ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাটিও পাশাপাশি পর্যালোচনার দাবী রাখে। বর্তমান প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনের সনাতনী ভূমিকায় রুপান্তর ঘটছে এবং থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন প্রশাসনের গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে। জেলা সদরগুলোতে শিল্পায়ন ও নগরায়ন প্রসার হওয়ার পাশাপাশি সেখানে শক্তিশালী নগর পরিষদ বা পৌরসভাসমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এসব কারণে জেলা ও থানা পর্যায়ের মাঠ প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

দুই. বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ঃ ঐতিহাসিক বিবর্তন

অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান ১৯৮২ সাল লিখিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে লোক প্রশাসনে বাংলাদেশকে আবিষ্কারের একটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য প্রয়াস চালান।[১৫] তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ভূখন্ড তথা উপমহাদেশে রাষ্ট্রচিন্তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস এবং রাষ্ট্রযন্ত্র তথা প্রশাসন ব্যবস্থার একটি আদল পাওয়া যায়, যা আমাদের বর্তমান মাঠ প্রশাসন কাঠামোর ঐতিহাসিক বিবর্তন শীর্ষক আলোচনার মূল ভিত্তি রচনা করেছে। তিনি প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও স্বাধীন রাজাদের আমল, মুসলমান আমলের মধ্যে সুলতানী, মোঘল ও নবাবী আমল এবং সর্বশেষ বৃটিশ আমলের স্থানীয় শাসনের আলোচনায় দেখতে পান যে, মুলতঃ প্রদেশ/বিভাগ/জেলা/মহকুমা, থানা/সার্কেল, গ্রাম/মৌজা এই কয়টি ভৌগোলিক বিভাজনে এদেশের প্রশাসনিক এককের ঐতিহ্য প্রায় ২৫০০ বছরের পুরানো। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নামের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মূল বিষয় প্রায় অপরিবর্তিতই রয়েছে বলা যায়। অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান প্রণীত বাংলাদেশের লোক প্রশাসন ও প্রশাসক শীর্ষক ছকটি এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হিসেবে দেখা যেতে পারে (ছক-১)।

ছক–১ বাংলাদেশের লোক প্রশাসন ঃ প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসক

হিন্দু আমল		মুসলমান আমল (সুলতানী)		মুসলমান আমল (মোঘল/নবাবী)		বৃটিশ আমল (১৭৮০-১৯৪৭)	
প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক	প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক	প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক	প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক
ভুক্তি	উপরিক	ইকলিম	ওজরী	সুবা	সুবেদার/নাজিম	প্রদেশ/বিভাগ	গভর্ণর/কমিশনার
বিষয়	বিষয়পতি/কুমারমাত্য	আরশা	শার-ই-লস্কর	সরকার/ চাকলা	ফৌজদার	জেলা	ডিসি/ডিএম/কালেক্টর
মন্ডল/বীথি	অধিকরণিক	শহর	ঐ	পরগণা	শিকদার	মহকুমা	এসডিও
গ্রাম	গ্রামপতি/গ্রামিক মহাত্তার	কসবা খিট্রা	ঐ	থানা	থানাদার	সার্কেল/থানা ইউনিয়ন/গ্রাম	সিও/ওসি

বৃটিশ আমল থেকে স্থানীয় প্রশাসনিক এককের সমপর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। সে প্রবণতাটি এখনও চালু আছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি প্রশাসনিক এককে প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এখানে বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে স্থানীয় প্রশাসনিক এককের পাশাপাশি চালুকৃত স্থানীয় সরকার ইউনিয়নগুলোর একটি তালিকা ছক-২ এ দেয়া হলো।

ছক-২ : বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তর/একক ও স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক বিবর্তন ১৭৯৩-১৯৯৮

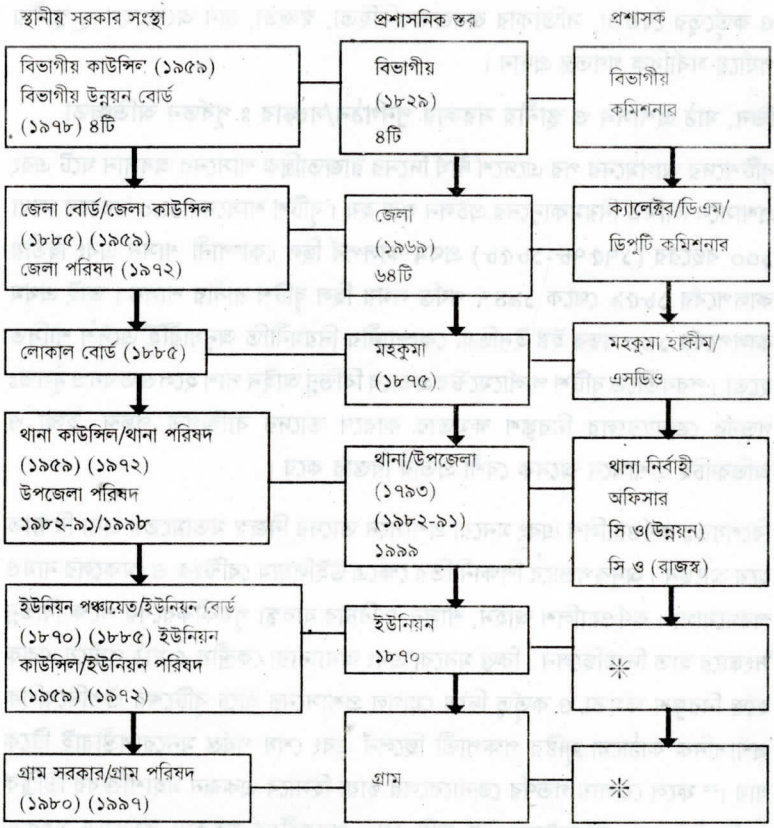

* ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড এবং গ্রাম পর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রশাসক নেই। তবে বিভিন্ন বিভাগের কিছু মাঠ কর্মী রয়েছে। প্রতিটি বক্সে নির্দেশিত সন ঐ স্তরটি শুরুর সন বা বছর হিসাবে ধরে নেয়া যায়।

স্থানীয় প্রশাসন তথা মাঠ পর্যায়ের জন প্রশাসনের বিবর্তনের প্রায় আড়াই হাজারের বছরের ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আমাদের আজকের বিভাগ, জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম যথাক্রমে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলের ভুক্তি, বিষয়, মন্ডল, বীথি ও গ্রামেরই প্রতিরূপ। তাই প্রশাসনের ভৌগোলিক বিভাজনে আমাদের মৌলিকত্ব একেবারেই নেই। তবে কার্যপরিধি, সাংগঠনিক এবং জন সাধারণের অন্তর্ভুক্তির কথা বিবেচনা করলে বৃটিশ আমল থেকে সূচিত পরিবর্তনগুলো মৌলিক ও যুগান্তকারী। বিশেষতঃ বৃটিশ আমল থেকে স্থানীয় সরকার কাঠামোর সূত্রপাতের বিষয়টি পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। এখনও আমাদের মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের যে সমস্যা আধুনিক বিকেন্দ্রীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান করা সম্ভব হয়নি তা হচ্ছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দ্বৈততা, সত্যিকার জনজবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, জন অংশগ্রহণ ও স্থানীয় পর্যায়ে সর্বাধিক গণতন্ত্র প্রদান।

তিন. মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার পুর্নগঠন/সংস্কার ঃ পূর্বতন অভিজ্ঞতা

বৃটিশদের আগমনের পর এদেশে দীর্ঘ দিনের রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে এবং প্রশাসনে লিখিত নিয়মকানুনের প্রচলন শুরু হয়। বৃটিশ শাসনের ১৯০ বছরের মধ্যে ১০০ বছরের (১৭৫৭৮-১৮৫৮) প্রথম কালপর্ব ছিল কোম্পানী শাসন এবং দ্বিতীয় কালপর্বের ১৮৫৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময় ছিল বৃটিশ রানীর শাসন। তাই প্রথম কালপর্বের ১০০ বছর ইষ্ট ইনডিয়া কোম্পানীর নিয়মনীতি অনুযায়ীই এদেশ শাসিত হতো। পরবর্তীতে বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রভাবে বিভিন্ন আইন পাশ হলেও তখনও মূলতঃ গভর্নর জেনারেলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার কারণে তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ, ইচ্ছা ও অভিরুচিই প্রশাসনে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

বিশেষতঃ কর্ণওয়ালিশ এবং মনরো প্রশাসনে তাদের নিজস্ব মতামতের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। অনুরূপভাবে শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে উইলিয়াম বেন্টিংক ও মেকলের নামও স্মরণযোগ্য। কর্ণওয়ালিশ আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা পৃথকীকরণের পক্ষে বিভিন্ন সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু মনরো এবং অন্যান্যরা কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে একক হস্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে মোগল প্রশাসনের ধাঁচে বৃটিশের ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মনরোপন্থীরাই টিকে যায়।[১৬] ফলে জেলায় গভর্ণর জেনারেলের ছায়া হিসাবে একজন মহাশক্তিধর ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরের পদ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে মহকুমা পর্যায়েও মহকুমা হাকীমের পদ সৃষ্টিসহ প্রশাসনে বিভিন্নমুখী সংস্কারের উদ্দ্যোগ নেয়া হয়। তবে বৃটিশগণ ১৮৫৭ সনের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে একটি দর্শন মেনে চলতো।

সেটা হচ্ছে যথা সম্ভব বড় ধরনের কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার এড়িয়ে যাওয়া। তাই শেষ পর্যন্ত সরকার বৃটিশ মশলা মিশিয়ে পূর্বের সকল কাঠামো ও অবকাঠামো দিয়ে যে গুরুপাক প্রশাসনিক ঘন্ট পরিবেশন করা হয় তা মূলতঃ মোগলাই। মোগলদের রেখে যাওয়া কাঠামোকে খুব সামান্যই তারা পরিবর্তন করেছেন। মোগল কাঠামোর উপরই মূলতঃ ভারতে বৃটিশ প্রশাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ এ পাকিস্তান ও ভারত দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হবার পর স্বাধীনতার তৃতীয় বছরের মধ্যে ভারতে সংবিধান লিখিত হয়ে গেলেও পাকিস্তানে ১৯৫৬ সনের পূর্বে তা সম্ভব হয়নি। আবার ১৯৫৬ সনে গৃহীত সংবিধান ১৯৫৮ সনে স্থগিত বা বাতিল হয়ে যায়। ১৯৬২ সনে সামরিক সরকার কর্তৃক একটি সংবিধান লেখানো হয় যা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। তাই পাকিস্তানের পুরো ২৩ বছর (১৯৪৭-১৯৭০) সময় রাজনীতি ও প্রশাসন কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা লাভে ব্যর্থ হয় এবং প্রশাসনে মূলতঃ বৃটিশ ধারাবাহিকতাই রক্ষা করা হয়।

১৯৭১ সন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করার পর এক বছরের কম সময়ে একটি সংবিধান রচনা করা হয় এবং স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নানাবিধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সে প্রচেষ্টাসমূহের অন্যতম হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে গঠিত প্রশাসনিক ও চাকুরী পুনর্গঠন কমিটি, বেতন ও চাকুরী কমিশন, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর থেকে ২৭/২৮ বছরে প্রায় দুই ডজন বিভিন্ন কমিটি/কমিশন কাজ করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় কোন ক্ষেত্রে প্রশাসনের কাঠামো, কার্য ও সেবাদান প্রক্রিয়ায় ঐসব কমিটি/কমিশনের প্রতিবেদনসমূহ মৌলিক কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। এমন কি পূর্বের অনেক কমিটি ও কমিশনের প্রতিবেদন গোপনীয় দলিলের মতো সরকারী নথিবন্দী অবস্থায় আছে। কিছু কিছু কমিটি ও কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও তার বাস্তব কার্যকারিতা নেই বললেই চলে। বর্তমান সময়ে কার্যরত প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের দুইজন চেয়ারম্যান স্বেচ্ছায় পদত্যাগের পর তৃতীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যম কমিশনের কাজ শুরু হয়েছে।* এ পর্যন্ত প্রায় ১৬টি বিষয়ে কমিশন তাদের সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করেছে। কিন্তু সুপারিশকৃত বিষয়সমূহের তালিকা দেখে মনে হয় কমিশন অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনের মৌলিক বিষয়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত

---

* দুইজন প্রাক্তন সচিব নুরুন নবী চৌধুরী ও কাজী ফজলুর রহমান পদত্যাগ করার পর অপর এক প্রাক্তন সচিব এ, টি, এম, শামসুল হককে একজন পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদায় কমিশনের সভাপতি নিয়োগ করা হয়। জনাব হকের নেতৃত্বে কমিটি নভেম্বর ১৯৯৭ইং থেকে দুই বছরের জন্য কাজ করছেন।

কম গুরুত্বপূর্ণ আমলাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ সুযোগ সুবিধা ও নিয়মনীতি নিয়ে অনেক বেশী সময় ব্যয় করেছে। যেমন পেনশন, শীর্ষ আমলাদের যানবাহন সুবিধা, সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীর বয়স, অবসর ইত্যাদি।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এ যাবত যতগুলো কমিটি/কমিশন কাজ করেছে তার মধ্যে দুটি কমিশনের প্রতিবেদনকে গবেষণামান, সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনীতি ও প্রশাসনে মৌলিক পরিবর্তন আনার ইঙ্গিতবাহী হিসাবে অন্য সবার উর্ধ্বে স্থান দেয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে ১৯৭২ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বনামধন্য শিক্ষক ও উপাচার্য অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্ব গঠিত Administrative and Services Reorganization Committee (ASRC) বা চৌধুরী কমিটি[১৭] ও ১৯৮২ সনের ২৮শে এপ্রিল রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খানের সভাপতিত্বে গঠিত The Committee for Administrative Reorgangation/Reform (CARR) বা খান কমিটি।[১৮] চৌধুরী কমিটি ১৯৭৩ সনের অক্টোবর মাসের মধ্যে তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। খান কমিটি দুই মাসের কম সময়ের মধ্যে (২২শে জুন ১৯৮২) ২৬৮ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করে। এই দুটি প্রতিবেদন ছাড়া এ লক্ষ্যে আরও বহু কমিটি কমিশনের প্রতিবেদন এবং গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

অন্যান্য কমিটি কমিশনের অবদানকে খাটো না করেও এটুকু বলা যায় যে, প্রতিবেদনের গবেষণা মান ও বিষয়বস্তুর মৌলিকত্বের দিক থেকে এ দুটি প্রতিবেদন এদেশের প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান পেতে পারে। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের বিভিন্ন সংস্কার প্রচেষ্টার ভাল দিক এবং বাংলাদেশের স্বপ্নকল্পনার রূপায়ণে সহজ ও জটিলতা মুক্ত একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার রূপরেখা প্রণয়নে মোজাফফর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিশন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে সম্পন্ন করে। মূলতঃ দুটি কারণে এটি সম্ভব হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়, (১) তৎকালীন সরকার কমিশনের কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে কমিশনকে চিন্তা ও কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন; (২) মরহুম মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সততা, নিষ্ঠা ও পান্ডিত্য এই প্রতিবেদনের গুণগত পিছনে ছিল মূল নিয়ামক শক্তি।

বর্তমান সময়ের গঠিত কমিশনগুলো (শামসুল হক কমিশন-১৯৯৭) বহু আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, যা তখনকার কমিশন পায়নি। তারপরও তাদের দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও সততা সর্বোপরি বিষয়বস্তুর উপর সুগভীর পান্ডিত্য ঐ প্রতিবেদনকে

একটি ক্লাসিক ডকুমেন্টে পরিণত করেছিল। পরবর্তীতে এম এ খান কমিটির প্রণীত রিপোর্ট মূলতঃ চৌধুরী কমিটির প্রতিবেদনের ছায়া হিসাবেই তৈরী হয়। এ প্রতিবেদনেও যথেষ্ট পান্ডিত্য ও গবেষণার ছাপ দেখা যায়। এই দুই প্রতিবেদন শুধুমাত্র পান্ডিত্য ও গবেষণাধর্মিতার গুণে বিশিষ্ট তা নয়, বিষয়বস্তুর মৌলিকত্বও প্রতিবেদন দুটিকে পরবর্তী অনেক প্রতিবেদনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।

চৌধুরী কমিটি সচিবালয় পুর্নগঠন, কর্ম পদ্ধতি (Procedure of work), মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর পুর্নগঠন, জেলা ও অন্যান্য মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন, বেতন ও চাকুরী কাঠামো, বিভিন্ন সার্ভিস ক্যাডারের একত্রীকরণ ও পুর্নবিন্যাস (১৩টি কেন্দ্রীয় ক্যাডার ও ২৭টি প্রাদেশিক ক্যাডারসহ সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ,পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ) ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত বাস্তবসহ সম্মত সুপারিশ প্রণয়ন করে। চৌধুরী কমিটির সুপারিশসমূহের মধ্যে যা দেশের সরকারী কর্মচারী কাঠামোকে সুসংহত করেছে তা হচ্ছে বিভিন্ন বেতন স্কেল ও ক্যাডারকে একটি একক ব্যবস্থার অধীনে আনায়ন যা সত্যিকার অর্থে ছিল দুরূহ কাজ। ঐ কমিটি সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০ ধারাসমূহের আলোকে মাঠ প্রশাসনের স্তর এবং স্থানীয় সরকার কাঠামোর উপর অত্যন্ত স্বচ্ছ সুপারিশ প্রণয়ন করে। চৌধরী কমিটি দেশের সকল মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তর করা এবং বিভাগীয় স্তরের প্রশাসনিক একক বিলুপ্তির পক্ষে মত দেয়। জেলায় একটি শক্তিশালী প্রশাসনের সুপারিশসহ ডেপুটি কমিশনারের কর্ম পরিধির একটি নতুন রূপরেখা প্রণয়ন করে এবং জেলা, থানা ও ইউনিয়ন এই তিন স্তরে স্থানীয় সরকার গঠনের পক্ষে মতামত দেয়।

থানা পরিষদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়ার বিষয়টি ১৯৮২ সালে বাস্তবায়িত হলেও চৌধুরী কমিটিই প্রথমবারের মত কৃষি, গ্রামীণ প্রকৌশল, পশুসম্পদ, স্বাস্থ্য ও গ্রামীণ স্যানিটেশান, শিক্ষা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমবায়, মৎস্য উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি থানা পরিষদে স্থানান্তরের সুপারিশ করে। তা ছাড়া বিভাগ বা বৃহত্তর জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠনের ব্যাপারেও চৌধুরী কমিটির সুপারিশ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রতিবেদন সাধারণের পাঠ ও পর্যালোচনার জন্যে কখনও উন্মুক্ত করা হয়নি। এই রিপোর্ট পুনর্মূল্যায়ন করা হলে অনেক ক্ষেত্রে নতুন কমিটি গঠন করার প্রয়োজন পড়ে না। তাই প্রতিবেদনটির উপর বর্তমান কমিশন (শামসুল হক কমিশন) এর কাছ থেকে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন আশা করা যায়। খান কমিটির প্রতিবেদন সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এটি অনেক ক্ষেত্রে চৌধুরী কমিটি জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন

পুনর্বিন্যাসের যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করে তাকে ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেছে। চৌধুরী কমিটির মত এ কমিটিও মহকুমা ও বিভাগীয় স্তর বাতিলে সুপারিশ করে। বাংলাদেশের জনপ্রশাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে এই দুটি প্রতিবেদন গবেষণামান ও সুপারিশের বাস্তবতার নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চৌধুরী কমিটি (১৯৭৩) ও খান কমিটি (১৯৮২) ছাড়াও পরবর্তীতে গঠিত অন্য দুইটি স্থানীয় সরকার কমিশনের উপরও কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। কারণ প্রথমতঃ এই দুইটি কমিশনের রিপোর্টের বৃহত্তর অংশ বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার কাঠামোতে মারাত্মক কিছু অসঙ্গতি রয়ে যাচ্ছে যা ভবিষ্যত স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। তৃতীয়ত ঃ এই প্রতিবেদন ও প্রতিবেদনভিত্তিক বিভিন্ন আইন ও বিধিগুলোতে স্থানীয় সরকারকে প্রশাসন বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয়েছে। সামগ্রিক জনপ্রশাসনের জটিল সম্পর্ক এখানে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। এ দুটি প্রতিবেদনের প্রথমটি হচ্ছে তৎকালীন তথ্য মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে ১৯৯২ সালে গঠিত স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশনের প্রতিবেদন[১৯] ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে এডভোকেট রহমত আলী এম পির সভাপতিত্বে ১৯৯৭ সালে গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিবেদন।[২০] চৌধুরী কমিটি (১৯৭৩) ও খান কমিটির (১৯৮২) তুলনায় এ দুটি রিপোর্টের বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহের পিছনে গবেষণা সমর্থন (পূর্বে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মগুলোর কোন পর্যালোচনা) নেই বললেই চলে। যদিও সুপারিশসমূহের অধিকাংশ হয় ইতোপূর্বে বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা সমর্থিত বা নয়তো বিতর্কিত ছিল। কিন্তু কোনরূপ পর্যালোচনা বা পূর্বে কোন গবেষণাকর্মের কোন ধরনের উল্লেখই এ প্রতিবেদন দুটিতে নেই। দুটি প্রতিবেদনেই সমসাময়িক কালের সরকারের রাজনৈতিক মতামতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কমিশনের নিরপেক্ষ কোন অবস্থান বা প্রচলিত ভিন্নমতসমূহের নিজস্ব কোন মূল্যায়ন নেই। যেমন নাজমুল হুদা কমিশন ইউনিয়ন ও জেলা দুইস্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। কিন্তু তখনই দেশে উপজেলা স্তরের পক্ষে প্রবল জনমত ছিল এবং বিভিন্ন জরীপ ও গবেষণা কর্মে উপজেলা পদ্ধতি ও ইউনিয়ন পরিষদ এই দুই স্তরের পক্ষে একটি মতও বহুল ভাবে আলোচিত হচ্ছিল।[২১] তা ছাড়া কমিশন সরাসরি মহিলা সদস্য নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদের তিনটি ওয়ার্ডের পরিবর্তে নয়টি ওয়ার্ড করার পক্ষে যে মত দেন বিভিন্ন গবেষণা কর্মে ইতোপূর্বে এ মতের জোরালো সমর্থন ছিল। কমিশন ঐ সব গবেষণার কোন উল্লেখ না করেই ঐ গবেষণার ফলাফলসমূহকে সরাসরি সন্নিবেশ করে।[২২] তাছাড়া স্থানীয়

সরকারে সংসদ সদস্যের সম্পৃক্তি, গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো না করে গ্রামকে স্বেচ্ছাসেবী ও কমিউনিটি উদ্যোগের জন্যে উন্মুক্ত রাখার পক্ষেও জোরালো মতামত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়। যার কোন পর্যালোচনা বা উদ্ধৃতি কমিশন প্রতিবেদনে দেখা যায়নি।[২৩] এই জাতীয় একমুখিতা একটি কমিশন রিপোর্টের সম্পূর্ণতা ও নিরপেক্ষতাকে প্রশ্ন সাপেক্ষ করে তোলে এবং বিশ্বাসযোগ্যতা কমিয়ে দেয়।

রহমত আলী (১৯৯৭) কমিশনের প্রতিবেদনের পরিসর হুদা কমিশনের তুলনায় কিছুটা বিস্তৃত হলেও একই ধরনের সীমাবদ্ধতা থেকে এ প্রতিবেদনও মুক্ত হতে পারেনি। প্রতিবেদন পড়ে মনে হয় সুপারিশগুলো আগে থেকেই তৈরী ছিল, শুধু একটি কমিশন করে বৈধতা দানের প্রয়োজনে এই প্রতিবেদনটি লেখা হয়। সংবিধানের অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করে চার স্তর বিশিষ্ঠ একটি কাঠামো এ প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু দেশে প্রচলিত স্থানীয় সরকার বিষয়ক প্রায় সকল আলোচনা ও গবেষণায় চার স্তরের সমর্থন পাওয়া যায়নি। তেমনিভাবে সংবিধানের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় প্রশাসনিক স্তর, কাঠামো এবং সংসদ সদস্যদের ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে সমসাময়িক গবেষণা ফলাফল ও সুপারিশসমূহের কোন আলোচনা এ প্রতিবেদনে নেই। শেষোক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ সংক্রান্ত আইন ইতোমধ্যে পাশ হয়েছে। সংসদে এবং সংসদের বাইরে এ সব আইন নিয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা না হওয়ায় কারণে নতুন স্থানীয় সরকার তার আকাঙ্ক্ষিত শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হয় না।

চার. মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার ঃ একুশ শতকের ভাবনা

৪.১ মাঠ প্রশাসন ঃ

এই প্রবন্ধের পূর্ববর্তী অংশের আলোচনায় বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠ প্রশাসনের তত্ত্বীয় আলোচনার সাথে বাংলাদেশের বিরাজিত বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তুলনা করলে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা বা একটি সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া খুবই কঠিন। বর্তমান বাংলাদেশে মাঠ প্রশাসন নামক একীভূত বা একক কোন কাঠামো নেই। জেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসন বলতে একসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসী, ভূমি ও ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের সকল ধরনের সাধারণ অভিযোগ শোনার একমাত্র ব্যবস্থা হিসাবে জেলা প্রশাসনকে বুঝানো হতো। জেলা প্রশাসন তথা কালেক্টরেট নামক একটি সরকারী ভবনকে জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গণ্য করা হতো। জেলা প্রশাসক সাধারণ প্রশাসন ছাড়াও এক

ধরনের অছি বা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন। জেলার সামগ্রিক প্রশাসনের মুখপাত্র এবং ঐক্যের প্রতীক হিসাবেই তাকে ধরে নেয়া হতো। বৃটিশ আমলে নির্বাহী, বিচার ও রাজনৈতিক ক্ষমতার একক অধিকারী হিসাবে এই পদটিকে গড়ে তোলা হয়। ক্ষমতার আইনগত ভিত্তি অত্যন্ত স্পষ্ট না হলেও অনানুষ্ঠানিক ও সনাতনী ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে জেলা প্রশাসনের দপ্তর ও বাংলোর খোলস থাকলেও সামন্তের দাপট এখন বিলুপ্ত। অপরদিকে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের চাহিদা অনুযায়ী যৌক্তিক আইন কাঠামোর আওতায় একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বিকল্প কাঠামোও সেখানে গড়ে উঠেনি। তাই জেলা প্রশাসনে এখনকার সংকট বহুমুখী। একদিকে সাধারণ জেলা প্রশাসন সনাতনী একটি সমন্বিত প্রিফেক্টরাল পদ্ধতির প্রাণহীন অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অপরদিকে জনপ্রতিনিধিত্বশীল বিকেন্দ্রীকৃত (Devolution) ব্যবস্থা সৃষ্টির দৃঢ় সাংবিধানিক অঙ্গীকার সত্ত্বেও সে ব্যবস্থা হালে পানি পাচ্ছে না। তাই একদিকে সনাতনী আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ অকেজো ও শিথিল অপরদিকে জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন, উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার কোন কাঠামো গড়ে উঠছে না।

অন্যদিকে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রশাসনে প্রত্যর্পণ পদ্ধতির (Delegation System) ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে এবং এই অপব্যবহার প্রশাসনের সামগ্রিক গতিধারাকে একটি ভিন্ন স্রোতে সামিল করেছে। যার পরিণতি সামগ্রিকভাবে জবাবদিহিমূলক ও গণমুখী সেবা কাঠামো গড়ে উঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় ৪০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনে রয়েছে শতাধিক সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, দপ্তর ও অধিদপ্তর। এই সব দপ্তর-অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ বিভাগ, জেলা, থানা এমন কি তার নীচেও তাদের কার্যক্রম বিস্তার করে চলেছে। পাশাপাশি আবার এই সব দপ্তর ও অধিদপ্তর স্বল্পকালীন কিছু এলাকাভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্টি করে চলেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্প প্রশাসন। কেন্দ্রীয় সরকারের এইসব দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ জেলা ও থানা পর্যায়ে একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই জাতীয় সম্প্রসারণ ও বিস্তৃতি ভবিষ্যতের যে কোন ব্যয় সাশ্রয়ী ও জনসম্পৃক্তিমূলক মাঠ প্রশাসন কাঠামো এবং শক্তিশালী স্থানীয় সরকার সংস্থা গঠনের পথে বড় অন্তরায় ও হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিগত দুই দশক ধরে চতুর্থ একটি ধারাও বাংলাদেশের জনপ্রশাসনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে এবং ভবিষ্যতেও মাঠ প্রশাসনকে একটি বাস্তবসম্মত কাঠামোয় অধিষ্ঠিত করতে হলে সে চতুর্থ ধারাকে সামগ্রিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করে নিতে হবে।

সে চতুর্থ ধারাটি হচ্ছে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি। তাই বিকেন্দ্রীকরণে বিরাষ্টীয়করণ ধারণার বাস্তব প্রয়োগ এখানে প্রয়োজন পড়বে।

তাই উপরোক্ত চারটি অংশীদারের উপস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতে মাঠ প্রশাসনের সকল ধরনের সংস্কারে যেতে হবে। সে চারটি অংশীদার হচ্ছে আমলাতন্ত্র, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিশেষায়িত এজেন্সী কাঠামো তথা করপোরেশন, অধিদপ্তর, বোর্ড ইত্যাদি এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা বা অন্যান্য সিভিল সোসাইটি সংগঠন। বর্তমান এই চারটি অংশীদার ভারসম্যপূর্ণ কোন একক ব্যবস্থার অধীনে কাজ করছে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তিতে প্রশাসন, উন্নয়ন, সেবাদান ইত্যাদিকে খেয়াল খুশী মত ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা পরস্পর বিরোধী ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হচ্ছে। এই বিষয়টির নিষ্পত্তি বর্তমানকার মাঠ প্রশাসনের একটি প্রধানতম বিষয় হওয়া উচিত। এই বিষয়টির নিষ্পত্তি বা সমাধানের প্রধান সূত্র হওয়া উচিত বিভাগ, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন এই সকল পর্যায় বা স্তরের যে কোন একটিকে প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু (ocal point) হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া। তারপর সে কেন্দ্রবিন্দুর সাথে প্রান্তীয় সংগঠনসমূহকে সম্পর্কিত করা। কেন্দ্রবিন্দু নির্ণীত হবার পর সে কেন্দ্রবিন্দুর কেন্দ্রীয় প্রশাসক কে হবেন এবং কীভাবে হতে পারেন সেটি নির্ধারণ করা যাবে। বিকেন্দ্রীকরণের চারটি ভিন্ন প্রকার ও পদ্ধতি এবং মাঠ প্রশাসনের তত্ত্বের তিনটি মতের পর্যালোচনা করে দেশীয় প্রয়োজন ও ঐতিহ্যের নিরিখে তা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

বর্তমানে আমাদের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে কোন কেন্দ্রবিন্দু কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং মনিটর কোনটাই নেই। প্রত্যেকটি বিভাগ, দপ্তর অধিদপ্তর স্ব স্ব বিভাগীয় সদর দপ্তরের কাছ থেকেই সিদ্ধান্ত পায়। মাঠে সত্যিকার অর্থে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না। সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন এবং সফলতা বা বিফলতার সঠিক কোন মূল্যায়নও হয় না। এখন প্রশ্ন দেখা দিবে মাঠপর্যায়ের প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুটি কোথায় কোন স্তরে হবে? ইতোপূর্বে ১৯ ০ সনের পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি বিভাগ পর্যায়ের প্রশাসনিক একক বাতিলের সুপারিশ করেছে। তাই বিভাগের প্রশ্নটি পুনরায় নতুন করে আলোচনা অবান্তর। জেলা ও থানার মধ্যে বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ করা যায়। জেলা সুদীর্ঘ ২০০ বছরের বেশী সময় ধরে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও কোন সমন্বিত ব্যবস্থার অধীনে না হলে ও জাতীয় বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নীচে জেলা স্তরকেই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তর বা একক মনে করা হয়। তাই জেলা স্বাভাবিক ভাবেই মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায়। কিন্তু

বিগত দুই দশকে জেলা ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থানা যথা উপজেলা পর্যায়ে স্থানান্তর করে কিছুটা সুফল পাওয়া গেছে। উপজেলা এখন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে জেলার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। তাই জেলা প্রশাসন ও পরিবর্তিত অবস্থায় উপজেলা পদ্ধতির সামগ্রিক মূল্যায়ন করে এ ব্যাপারে একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হবে। দীর্ঘ দিন ধরে আমাদরে দেশের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন বলতে সাধারণত থানা ও জেলা স্তরকেই বুঝানো হতো। বিভাগ ও মহকুমা স্তর সব সময়ই থানা ও জেলার তুলনায় নিষ্প্রভ ছিল। ইতোমধ্যে মহকুমা বিলুপ্ত হয়ে জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রশাসনে অপচয় রোধ, অর্থ সাশ্রয় ও জনবল বিন্যাসের জন্যে বিভাগীয় স্তরটিও বাতিল করা প্রয়োজন।

থানা ও জেলার মধ্যে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিত ও চাহিদা অনুযায়ী জেলাকে নিম্নস্তরের সকল সংস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা সমন্বয়ের এবং থানাকে সরকারের সকল কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জ্যোতিকেন্দ্রে হিসাবে গড়ে তোলা উচিত। বর্তমানকার জেলা ও উপজেলার ভৌত অবকাঠামো, জনবল, সিভিল সোসাইটি সংগঠন এবং সর্বোপরি জনপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো সবদিক দিয়ে এই জ্যোতিকেন্দ্র হবার উপযোগিতা এই দুইটি স্তরেই রয়েছে। তা ছাড়া ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সন পর্যন্ত উপজেলা পদ্ধতির একটি বাস্তব পরীক্ষাও হয়েছে।

জেলা একদিকে কেন্দ্র ও মাঠ প্রশাসনের সংযোগ, অপরদিকে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মনিটরিং, তত্ত্বাবধান ও কারিগরি সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তা ছাড়া উপজেলায় হস্তান্তরিত এবং হস্তান্তরিত নয় এমন বিষয়গুলোর কার্যক্রম সমন্বয়ে জেলা প্রশাসন জেলা পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে জেলা প্রশাসন বলতে যা বুঝায় তা জেলায় কর্মরত সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মকান্ড নয়। শুধুমাত্র ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের অধীনস্থ দপ্তরসমূহ নিয়েই বর্তমানে জেলা প্রশাসন। জেলায় বিচার, রেগুলিটরী, উন্নয়ন ও সেবামূলক এই চারটি বৃহত্তর বিভাজনে বৃহত্তর সরকারী বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্র রয়েছে। জেলা প্রশাসনের নির্বাহী বিভাগের সাথে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের একটি বড় অংশ বহু বছর ধরে যুক্ত রয়েছে। সে বিচার বিভাগীয় কর্মকান্ড থেকে নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাদের মুক্ত করে দিতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেসী পুরোপুরি জেলা জজের অধীনে চলে যাওয়া উত্তম। এটি আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকারও বটে।[২৪] তাই জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেসী বিচার বিভাগের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। বরঞ্চ তখন জেলা প্রশাসন সত্যিকার অর্থে নির্বাহী কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে। জেলায় কর্মরত সকল

বিভাগ, অধিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সকলেই সমন্বিতভাবে জেলা প্রশাসনের কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত হবে। একটি একক ব্যবস্থাধীনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা হবে।

মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের দ্বন্দ্বও এক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান প্রশাসনিক ও প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন দুইটির সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার পথে একটি অন্যতম অন্তরায়। প্রশাসনিক ইউনিটে কর্মরত বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা ও একই ইউনিটের স্থানীয় সরকারকে একই কার্যতালিকা দেয়া হচ্ছে। যেমন, কৃষি উন্নয়ন মূলতঃ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কাজ এবং এ কাজের জন্যে তাদের প্রয়োজনীয় জনবল, দক্ষতা ও অর্থ সম্পদ রয়েছে। মাঝখানে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায়ও কৃষি উন্নয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু এজন্যে স্থানীয় পরিষদগুলোর কোন অর্থ, জনবল ও দক্ষতা নেই। তাই স্থানীয় সরকার প্রকৃত পক্ষে কৃষি উন্নয়নের দায়িত্ব পাওয়া সত্ত্বেও কোন কাজই করতে পারে না। এ রকম ভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পয়নিস্কাশন সহ বহুবিধ কাজের ক্ষেত্রে বিষয়টি সত্য। তাই একই পর্যায়ে প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার ইউনিটে একই কার্যক্রমের দায়িত্ব দুইটি প্রতিষ্ঠানকে দিলে স্বাভাবিকভাবেই জটিলতা সৃষ্টি হবে। তাই স্থানীয় সরকার সংস্থা ও বিশেষায়িত সরকারী দপ্তরের কার্যপরিধির সুনির্দিষ্টকরণ প্রয়োজন। পরিস্কার বিভাজন থাকাও প্রয়োজন। সবচেয়ে ভাল হয় একই প্রশাসনিক একাংশে সমান্তরালভাবে দুটি প্রতিষ্ঠানকে পাশাপাশি না রেখে যে কোন একটিকে কাজ করতে দেয়া।

তবে এক্ষেত্রে মাঠ প্রশাসন তত্ত্বে উল্লেখিত তিনটি পদ্ধতি পুনঃ আলোচনা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমরা বৃটিশ, আমেরিকান, ফ্রান্স বা ইটালীয়ান কোন্ মডেল অনুসরণ করব? উপজেলা পরিষদের বর্তমান কাঠামোতে বৃটিশ, আমেরিকান এবং ইটালিয়ান মডেলের মিশ্রণ রয়েছে। মিশ্রণের কারণে দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। বর্তমানকার উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী নির্বাচিত চেয়ারম্যানই উপজেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী হবেন।[২৫] এই আইনে উপজেলা পরিষদের ১৮টি কার্যবালীর উল্লেখ রয়েছে এবং ১০টি মন্ত্রণালয়ের থানা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরী পরিষদের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে।[২৬] এ ক্ষেত্রে থানায় ভূমি, রেজিস্ট্রেশন (সাব-রেজিস্ট্রার), স্বরাষ্ট্র (পুলিশ ও আনসার), খাদ্য, মাধ্যমিক শিক্ষা, শিল্প (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প), সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ এই

ব্যবস্থার বাইরে অবস্থান করছেন। এ ক্ষেত্রে পরিষদের বাইরে অবস্থানরত মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে পরিষদের এবং ঐ কর্মকর্তাদের অবস্থান কখনও সংশয়মুক্ত হবে না। আবার যে সব মন্ত্রণালয়ের জনবল ও কার্যক্রম ন্যস্ত হলো তারাও এক ধরনের দ্বৈত শাসনের আওতায় থাকবে। তাদের নিজ নিজ বিভাগ ও পরিষদ দ্বৈতভাবে তাদের উপর কর্তৃত্ব করবে। তবে শেষ পর্যন্ত বিভাগীয় কর্তৃত্বই বহাল থাকবে। আর অন্য দিকে স্থানীয় সংসদ সদস্যের ভূমিকাও পরিষদকে ভিন্ন একটি বাঁধনে আবদ্ধ করবে। কারণ উপজেলা আইন ১৯৯৮ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, পরিষদ উপদেষ্টা তথা এম পির পরামর্শ গ্রহণ করিবে।[২৭] গ্রহণ না করলে কি হবে সে কথাটি বলে না দিলেও সহজে অনুমেয়। এই অবস্থায় উপজেলা পরিষদ ও উপজেলার মাঠ প্রশাসন কোথায় দাঁড়াবে বা কোন ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত হবে তা পরিস্কারভাবে বুঝা না গেলেও ধারণা করা যায় যে, দ্বৈততা ও ত্রৈততার আবর্তে প্রতিষ্ঠানিকতা বিনষ্ট বা বাধাগ্রস্ত হবে। জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে একটি পরিষদ গঠন করা হলেও সংসদ সদস্যের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, সরকারী কর্মচারীদের উপর খরবদারির অত্যন্ত শিথিল ব্যবস্থা, থানার বেশকিছু বিভাগকে পরিষদের জবাবদিহিতার বাইরে রাখা ইত্যাদিসহ উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ২৫টি বিভিন্ন ধারা ও উপধারায় কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায় থেকে সরাসরি হস্তক্ষেপের স্পষ্ট বিধান রাখা হয়েছে।[২৮]

জেলায় বর্তমানে কোন জন প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান না থাকায় সেখানে অবস্থাটি এখন এমন যেন মাথা নেই তাই মাথা ব্যাথাও নেই। উল্লম্ব (Vertical) বা উপর নীচ বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ পূর্বের মত বহাল আছে। আনুভূমিক (horizontal) যোগাযোগ ও সমন্বয় খুবই ক্ষীণ। জেলা প্রশাসকের সমন্বয় সভায় পূর্বতন একটি রেওয়াজ এখনও আছে, তবে কোন মন্ত্রী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করলে সভায় ভাল সমাগম হয়। নতুবা জেলার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ সভাসমূহে অনুপস্থিত থাকে। তাই উপজেলা পর্যায়ের ডিভলিউশেন এর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পর্যায় নিয়েও নতুনভাবে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। জেলায় কর্মরত বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলার কর্মরত এনজিওসমূহকে নিয়ে প্রস্তাবিত একটি জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের গঠন এবং ঐ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ও কার্য পদ্ধতির একটি রূপরেখা অনত্র দেখা যেতে পারে।[২৯] প্রস্তাবিত জেলা পরিকল্পনা বই এর কাঠামোটি ছক ৩-এ দেখা যেতে পারে।

গ্রন্থাগার

ছক-৩ প্রস্তাবিত জেলা পরিকল্পনা বই এর কাঠামো

উৎস ঃ Ahmed, Tofail and Islam, M. Nurul (1995)

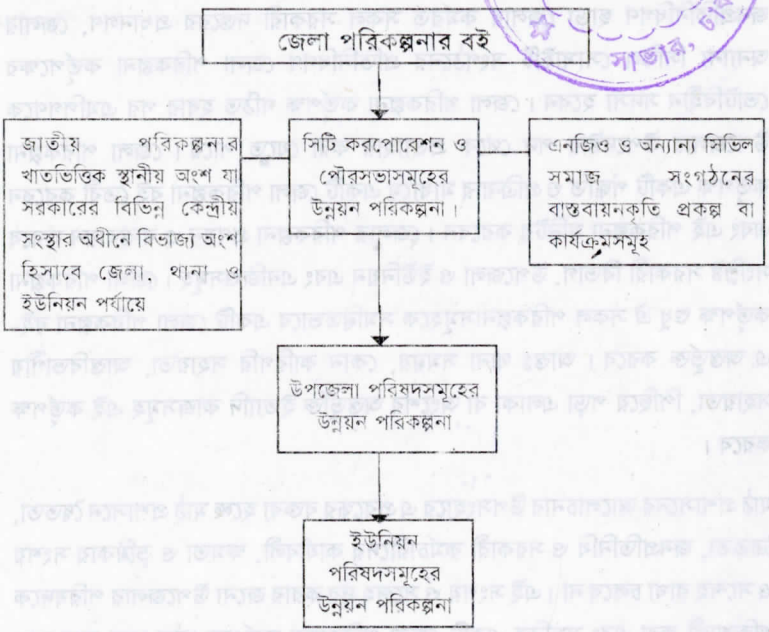

জেলা পর্যায়ে বর্তমান নতুনভাবে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় ও অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।[৩০] চৌধুরী কমিটি (১৯৭৩), বিচারপতি শাহাব উদ্দিন সাহেবের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং বার্ডের (কুমিল্লা) বিভিন্ন গবেষণায় জেলা পর্যায়ের নতুন করে স্থানীয় সরকার গঠন না করে একটি পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

এই জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ জেলার সকল এম পি এবং উপজেলার নির্বাচিত চেয়ারম্যান নিয়ে গঠিত হবে। এমপিদের মধ্য থেকে একজন এম পি উপজেলা চেয়ারম্যানদের এবং অন্যান্য এম পিদের ভোটে জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। বর্তমান জেলা পরিষদ ভবনটি জেলা পরিকল্পনা

কর্তৃপক্ষের দপ্তর হিসাবে ব্যবহৃত হবে। জেলা পরিষদের অন্যান্য সম্পত্তি জেলার অধীনস্ত পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদগুলোর মধ্যে বন্টন করে দেয়া যেতে পারে। জনপ্রতিনিধিগণ ছাড়া জেলায় কর্মরত সকল সরকারী দপ্তরের প্রধানগণ, জেলার অন্যান্য সিভিল সোসাইটি সংগঠনের প্রতিনিধিগণ জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের ভোটবিহীন সদস্য হবেন। জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠিত হবার পর এমপিগণকে উপজেলার উপদেষ্টার পদ থেকে প্রত্যাহার করা যেতে পারে। জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ একটি পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জেলা পরিকল্পনা বই তৈরী করবেন এবং এই পরিকল্পনা মনিটর করবেন। জেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ, উপজেলা ও ইউনিয়ন এবং এনজিওসমূহ। জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ শুধু ঐ সকল পরিকল্পনাসমূহকে সমন্বিতভাবে একটি জেলা পরিকল্পনা বই-এ অন্তর্ভূক্ত করবে। আন্তঃ থানা সমন্বয়, কোন কারিগরি সহায়তা, আন্তবিভাগীয় সহায়তা, পিছিয়ে পড়া এলাকা বা অংশের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি কাজসমূহ এই কর্তৃপক্ষ করবে।

মাঠ প্রশাসনের আলোচনার উপসংহারে এ প্রবন্ধের বক্তব্য হচ্ছে মাঠ প্রশাসনে দ্বৈততা, ত্রৈততা, জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মচারীদের কার্যাবলী, ক্ষমতা ও ভূমিকায় সংশয় ও সন্দেহ রাখা চলবে না। এই সংশয় ও সন্দেহ দূর করার জন্যে উপজেলার পরিষদকে শক্তিশালী করা এবং সমন্বিত একটি জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠন করা হলে ভাল সুফল পাওয়া যেতে পারে। উপজেলার উপর আর কোন স্থানীয় সরকার ইউনিট থাকার প্রয়োজন নেই।

জেলা হবে মাঠ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। উপজেলা হবে স্থানীয় সরকারের জ্যোতিকেন্দ্র। জেলা ও থানা পর্যায়ে একই ধরনের কাজ করার জন্যে বর্তমানে একাধিক বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও অধিদপ্তর কাজ করছে। যার ফলে কার্যপরিধি নিয়ে সংশয়, সন্দেহ, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা এবং সম্পদের অপচয় হচ্ছে। অপরদিকে একই ধরনের কাজ আবার এনজিওরাও করছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে স্থানীয় সরকার, সরকারী বিভাগ ও এনজিও এর মধ্যে সমন্বয়ের জন্যে অনেক দপ্তর ও অধিদপ্তরের একীভূতকরণ প্রয়োজন। সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমাজসেবা, মহিলা, যুব, প্রভৃতি অধিদপ্তর একীভূত হতে পারে। তাতে মূল্যবান সম্পদের সাশ্রয় হবে এবং প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে ইউনিটি অফ কমান্ড প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। জেলা ও থানা ছাড়া উপরে বিভাগ এবং নীচে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী সম্প্রসারণ না করে কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানের তথা ইউনিয়ন পরিষদ, সমবায়, এনজিও

প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপর বিভিন্ন দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া যায়। তা হলে সরকারের আকার আকৃতি ও ব্যবস্থাপনা সামর্থের দক্ষ ব্যবহার হওয়া সম্ভব।

৪.২ স্থানীয় সরকার

স্থানীয় সরকারের বৃত্তাবদ্ধতা

বৃটিশ ভারতের প্রায় দুইশত বছর এবং পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসকে বাদ দিয়েও স্বাধীন সার্বভৌম গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ২৭টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় সরকার অংগনের বৃটিশ বৃত্তাবদ্ধতা এতদিনেও অতিক্রান্ত হয়নি এবং স্থানীয় সরকারের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে এতগুলো বছর পরেও রাজনীতিবিদ, আমলাতন্ত্র, গবেষক, চিন্তাবিদ ও সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনার মেলবন্ধন ঘটেনি। এই মেলবন্ধনহীনতা বা প্রশাসনিক পরিভাষায় সমন্বয়ের অভাব এ দেশের স্থানীয় সরকার বিষয়ক চিন্তা ও কর্মের বৃত্তাবদ্ধতাকে একটি স্থায়ী রূপ ও কাঠামোয় অভিষিক্ত করতে যাচ্ছে। রাজনীতিবিদগণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে তাদের রাজনীতি চর্চার একটি কৌশলগত অস্ত্রের অতিরিক্ত কিছু এ পর্যন্ত অন্তত ভাবেননি। আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে তাদের প্রভাবকে অক্ষুন্ন রেখেই স্থানীয় সরকারের সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। গবেষক চিন্তাবিদদের প্রভাবশালী অংশ হয়ত জনবিচ্ছিন্ন নতুবা ক্ষমতাশালী আমলা-রাজনীতিবিদদের প্রভাব বলয়ভুক্ত। সর্বশেষ পক্ষ জনগণ। তাদের অবস্থা অনেকটা পিংপং বলের মত। সরকার বদল মানে খেলোয়াড় বদল। পুরোনো খেলা নতুন নামে শুরু হওয়া। এই হচ্ছে এ দেশের স্থানীয় সরকারের ভাগ্য বা দুর্ভাগ্য।

বৃত্তাবদ্ধতার স্বরূপ ও বিস্তৃতি

বৃত্তাবদ্ধতা বা দুষ্টচক্রের (Vicious circle) এই অচলায়তন আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বত্র। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থা এ অচলায়তানে বন্দি। তবুও মাঝে মাঝে ভেতর ও বাইরের অনেক ধাক্কা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় কিছু কিছু পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তোলে। সে ভাবেই হয়ত আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ও কর্মকান্ডে অনেক পরিবর্তন ধীরে হলেও সংগঠিত হচ্ছে। কিন্তু রাজনীতি ও প্রশাসনে সে পরিবর্তনশীলতার ছোঁয়া খুবই কম। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রাজনীতি ও প্রশাসনের একটি উপ-ব্যবস্থা (Sub-system) মাত্র। তাই এখানে বৃত্তাবদ্ধতার সংকট আরও গভীর।

স্থানীয় সরকারের বৃত্তাবদ্ধতাকে বুঝতে হলে সে বৃত্তাবদ্ধতার উপাদানগুলোকে ভালভাবে বুঝতে হবে। সে উপাদানগুলো মোটামুটি নিম্নরূপঃ

(১) ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক উত্তরাধিকার এবং সে উত্তরাধিকারের সম্পূরক ও পরিপূরক প্রচলিত আইন কাঠামো।

(২) রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং রাজনীতিকদের দুর্বলতা এবং

(৩) নাগরিক সমাজের যথাযথ ভূমিকার অভাব।

ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার

সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের সযত্ন লালন আমাদের স্থানীয় সরকার বিকাশের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের দুটি দিক রয়েছে। একটি প্রশাসনিক, অপরটি আইনগত। প্রশাসনিক দিকটি হচ্ছে বিভাগ, জেলা, থানা ইত্যাদি স্তরভিত্তিক প্রশাসন কাঠামো এবং ঐ কাঠামোগুলোতে আমলাতান্ত্রিকতার শতধারায় বিস্তৃতি। বৃটিশ আমলে অন্তত একটি সুবিধা ছিল যে, আমলাতন্ত্রের একটা চেইন অফ কমান্ড ছিল এবং প্রতিটি প্রশাসনিক একাংশে একজন প্রশাসকের একক কর্তৃত্ব ছিল। এখন আর তা নেই। এখন জেলা ও থানায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও করপোরেশনের আলাদ কাঠামো। বৃটিশরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য সাধারণ প্রশাসনের স্তর কাঠামো ও ক্ষমতাধর আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীন দেশে সে উত্তরাধিকারের সূত্র ধরে জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকার সবকিছুকে ঐ একই স্তর কাঠামোভিত্তিক আমলাতান্ত্রিকতার বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

আইন কাঠামোর ক্ষেত্রে দেখা যায় ভূমি আইন, প্রশাসনিক আইন, সিভিল ও পেনাল কোড এবং পুলিশ রেগুলেশন সব দিক থেকে আমরা এখনও সেই বৃটিশ আমলেই আছি। যুগ বদলায়, সমাজ বদলায়, বদলায় মানুষের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা। কিন্তু বদলায় না শুধু আইন। প্রশাসনের সর্বত্র এমন একটি অবস্থা দাঁড়ায় যেন আইনের প্রয়োজনেই মানুষ, মানুষের প্রয়োজনে আইন নয়। একটি উদাহরণ এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চলাফেরাকে সহজ, স্বচ্ছন্দ, নিরাপদ ও শোভন করার প্রয়োজনে মানুষ জুতা ব্যবহার করে। তাই সব-সময় পায়ের মাপে জুতা কেনা বা তৈরী হয়। কখনও সুদৃশ্য ছোট জুতায় প্রবেশ করানোর জন্যে পা কেটে ছোট করা হয় না। কিংবা সুন্দর বড় জুতার প্রয়োজনে ব্যবহারকারীদের পায়ে হাড় মাংস জুড়ে দিয়ে পা বড় করা হয় না। কিন্তু আমরা প্রশাসন, উন্নয়ন, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায়শই পা

কেটে জুতোসুদ্ধ করে যাচ্ছি। তাই দেখা যায় যখনই স্থানীয় সরকার সংস্কারের প্রশ্ন আসে তখনই অনিবার্যভাবে কিছু প্রসঙ্গ এসে পড়ে এবং যা মূল বিষয়টিকেই চাপা দিয়ে দেয়। যেমন,

- স্থানীয় সরকারের উপর-নীচে কয়টি স্তর করা হবে;
- এই স্তরগুলোকে কে বা কারা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে;
- স্থানীয় আমলাতন্ত্রের সাথে স্থানীয় সরকারের কি সম্পর্ক হবে;
- স্থানীয় সরকারে কার কি পদমর্যাদা হবে; এবং
- ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের জন্য কী কী সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা যাবে।

আমি মনে করি স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনভিত্তিক মুক্ত চিন্তাকে আঁতুর ঘরে গলা টিপে ধরার জন্যে ঐ পূর্ব নির্ধারিত সীমাবদ্ধতাগুলোই যথেষ্ট। আমরা বিগত অনেককাল যাবত ঐ একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছি। আমাদের সংবিধানে উৎকীর্ণ স্থানীয় সরকার বিষয়ক অনুচ্ছেদ, বিভিন্ন সরকার প্রবর্তিত আইন, নিয়মনীতি, এ্যাক্ট এবং অধ্যাদেশ কোনটিই এর ব্যতিক্রম নয়।

স্থানীয় সরকার ও সংবিধান ঃ সীমাবদ্ধতার বিশ্লেষণ

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূলতঃ চারটি অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কথিত বিধানসমূহ রয়েছে। কিন্তু সংবিধানের ঐ বিধানসমূহ অস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থবোধক। নিম্নে সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অংশগুলো উদ্ধৃত করা হলো ঃ

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশের (দ্বিতীয় ভাগ) ৯ এবং ১১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

"(৯) রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।"

"(১১) প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, সেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"

চতুর্থ ভাগের ৩য় পরিচ্ছেদের স্থানীয় শাসন শিরোনামের দুটি অনুচ্ছেদে যথাক্রমে ৫৯ এবং ৬০ এ বলা হয়েছে যে,

"৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। (২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেঃ-

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;

(খ) জনশৃংখলা রক্ষা;

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।"

"৬০। এই সংবিধানের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।"[৩১]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গৃহীত হবার পর ১৯৯১ সন পর্যন্ত সর্বমোট ১২টি সংশোধনী এতে আনীত হয়। সর্বশেষ সংশোধনীর পর ১১নং অনুচ্ছেদের শেষাংটি পুনস্থাপিত হওয়ায় "স্থানীয় শাসনের" একটি আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম একটি উদারনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান। কিন্তু প্রণয়নের তৃতীয় বর্ষ অতিক্রান্তির পূর্বেই প্রণেতাদের হাতে সংবিধানের উদার গণতান্ত্রিক নীতি-কাঠামোর খোল নলচে পাল্টে যায়। পরবর্তীতে সামরিক স্বৈরশাসকগণ কখনও স্থগিত কখনও পুনর্বহালের মাধ্যমে যে বেহাল অবস্থা সৃষ্টি করে তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে বাহুল্য মাত্র।

সংবিধানের যে ভিত্তির উপর স্থানীয় সরকারের বর্তমান ব্যবস্থা দাঁড়ানো বলে মনে করা হয় সে ভিত্তিও খুব স্বচ্ছ ও মজবুত নয়। তাই ১৯৯১ সনে সংবিধানের এ অনুচ্ছেদসমূহ পূর্ণভাবে বহাল হবার পরও ১৯৯৯ সনের বর্তমান সময় পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের একটি সর্বসম্মত কাঠামো ও কার্যাবলী চালু করা বাধা-বিঘ্নমুক্ত মনে করা যাচ্ছে না।

প্রথমতঃ ১১নং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় যাওয়া যেতে পারে। "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে"। এই সদিচ্ছার বাস্তবায়ন কিভাবে হচ্ছে বা হবে? প্রশাসনের সকল পর্যায় বলতে এখানে কি

বুঝানো হয়েছে, বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রশাসনের মূলতঃ দু'টি পর্যায় বা দিক, একটি ফাংশানাল দিক বা পর্যায়, অন্যটি হচ্ছে টেরিটোরিয়াল দিক। যেমন বিভাগ, জেলা, মহকুমা (এখন বিলুপ্ত), থানা, ইউনিয়ন, মৌজা, গ্রাম, শহর ইত্যাদি ভৌগোলিক একাংশ বা পর্যায়। আবার মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ফাংশানাল পর্যায়। তাই সংবিধান বর্ণিত 'জনগণের অংশগ্রহণ' কোন পর্যায়ে, বিভাগে হবে তার যথাযথ ব্যাখ্যা ছাড়া সকল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের ধারণাটি একটি wishful thinking ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ সংবিধানের চতুর্থভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫৯ অনুচ্ছেদের দফা (১) এ উল্লেখিত "প্রশাসনিক একাংশের" ধারণাটির সঠিক সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা ত্রুটিমুক্ত নয়। সংবিধানের ১৫২(১) এ দেখা যায় যে, "প্রশাসনিক একাংশ অর্থ জেলা কিম্বা এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য কোন এলাকা"।[৩২] সাধারণতঃ বিভাগ, জেলা, মহকুমা ও থানা এদেশে বৃটিশ আমল থেকে প্রশাসনিক একাংশ হিসাবে স্বীকৃত। অবশ্য এ স্বীকৃতিরও কোন সাংবিধানিক ভিত্তি নেই। নিতান্তই প্রশাসনিক আয়োজন মাত্র। তাই আমাদের সংবিধানে প্রশাসনিক একাংশ বলতে কোন্ কোন্ স্তরের কোন্ ধরনের প্রশাসনকে বুঝানো হবে তারও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দরকার। নতুবা বিষয়টিকে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা দলগোষ্ঠি দ্বারা ইচ্ছামত সম্প্রসারণ ও সংকোচন করা হতে পারে।

তৃতীয়ত ঃ শহরাঞ্চল যেখানে পৌরসভা ও পৌর করপোরেশন গঠিত হয় বা গ্রামাঞ্চল যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম পরিষদ গঠিত হয় বা হতে যাচ্ছে ঐ পরিষদগুলো কি ইতোপূর্বে আদৌ কোন প্রশাসনিক একাংশ হিসাবে স্বীকৃত ছিল? বর্তমানে ঢালাওভাবে এগুলোকে একাংশ ঘোষণা করা হচ্ছে। প্রশ্ন হতে পারে ঐ একাংশের প্রশাসনিক অধিকর্তা কে এবং তাঁর/তাঁদের কী কী প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব রয়েছে? এই একাংশসমূহ প্রশাসনিক একাংশ হবার শর্তাদি পূরণ করেছে কিনা? ইদানিং কালে গ্রাম পরিষদ আইন ১৯৯৭ এ গ্রামকে এবং একইভাবে উপজেলাকে প্রশাসনিক একাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোপূর্বে অন্য কোন স্তরে অবশ্য তা করা হয়নি। তা হলে পূর্বে গঠিত ঐ পরিষদগুলো বিশেষ করে পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনগুলো প্রশাসনিক একাংশ না হয়েও টিকে আছে কিভাবে?

চতুর্থত ঃ ৫৯নং অনুচ্ছেদের দফা (২) ক, খ ও গ এ যে সব কার্যাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে সে সব কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব, ক্ষমতা, জনবল, অর্থ ইত্যাদি কখনও কি ঐ সব স্থানীয় সরকারকে দেয়া হয়েছে? ক্ষমতা জনবল ও অর্থ সরকারের আমলাদের

হাতে রেখে শুধু নামমাত্র দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসনের একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এই প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক আয়োজন সম্পর্কে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও ব্যাখ্যাকারদের মতামত কি? এখানে কি সাংবিধানিক বিধান লংঘিত হচ্ছে বলে মনে হয় না ? আইন শৃংখলা, প্রশাসন, সেবা ইত্যাদির জন্যে সরকারী বাজেটের অর্থ খরচ করার অধিকারী ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে পৃথক পৃথক সরকারী প্রশাসনিক বিভাগের অধিকর্তাগণ। নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা এ ক্ষেত্রে নিতান্তই গৌণ। কিন্তু তাদের দীর্ঘ কার্য তালিকায় আইন শৃংখলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সকল কার্যক্রমের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ অবস্থাটি সংবিধানের লংঘন না পালন কি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে?

এখানে বৃত্তাবদ্ধতার প্রসঙ্গটি আবারও এসে পড়ে। যাঁরা দেশের সংবিধান প্রণয়নের মহান দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁরা সবাই অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উপর-নীচ কাঠামো বা পদসোপান এবং ঐ পদসোপানের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর আধিপত্যমুক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির বিষয়টি ঐ সময়ের ঐ পরিবেশে তাদের চিন্তাধারাকে নাড়া দেয়নি। তাই তারা প্রশাসনিক একাংশের সমান্তরালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির কথা বলেছেন। এমন কি 'স্থানীয় সরকার' শব্দটিও সংবিধানের বাংলা অংশে কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। বলা হয়েছে 'স্থানীয় শাসন' সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং লোকপ্রশাসন শাস্ত্রে 'স্থানীয় শাসন' ও 'স্থানীয় সরকারের' পৃথক ধারণা রয়েছে। ধারণাগত অর্থে এ দু'টি কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন বিষয়। তাই এখানেও যথাযথ ব্যাখ্যা বা নতুন শব্দ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। প্রশাসনিক একাংশের সাথে স্থানীয় সরকার সংস্থার গাটছাড়া বাঁধা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যক্রমে একটি মারাত্মক সীমাবদ্ধতা এনে দিয়েছে। তাই সংবিধানে প্রশাসনিক একাংশের বাঁধন থেকে স্থানীয় সরকারকে মুক্ত করে দিলেই স্থানীয় সরকারের স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হবে।

বিভিন্ন সংকট কালে সরকার ও বিরোধীদল সংবিধানকে উপস্থাপন করে নিজেদের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। বিগত ১৯৯১-১৯৯৬ সন পর্যন্ত বি এন পি সরকার জেলা ও থানা পর্যায়ে কোন নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাই চালু করেনি, সেটাকে সংবিধান লংঘনের ঘটনা হিসাবে তাদের কারও মনে হয়নি। আবার এখন আওয়ামী লগী সরকার সংবিধানের প্রশাসনিক একাংশের দোহাই দিয়ে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার করতে যাচ্ছেন। তাই সার্বিক বিবেচনায় একদিকে সংবিধানের স্থানীয় শাসন

বা স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিধি বিধানের যেমন পরিষ্কার ব্যাখ্যা প্রয়োজন তেমনি বর্তমান সময়ের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং প্রয়োজনকেও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া উচিত। তাই যেখানে সাংবিধানিক বিধান অস্বচ্ছ এবং প্রয়োগযোগ্য নয় সেখানে সাংবিধানিক বিধানকে প্রয়োগযোগ্য, বাস্তবানুগ ও স্বচ্ছ করতে হবে। অপরদিকে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও দলের প্রয়োজনকে সামনে রেখে সাংবিধানিক নীতি অপপ্রয়োগের প্রচেষ্টাকেও রুখতে হবে। আমাদের সংবিধান সুপরিবর্তনীয়। দুনিয়ার কোন সংবিধানই সর্ব কালের সকল মানুষের জন্যে অকাট্য ও অভ্রান্ত দলিল নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে তাই সংবিধানের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদেসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধনী আনায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

সংবিধান ও স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক আলোচনায় একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সংবিধানে 'স্থানীয় সরকার' নামক শব্দটি কোথাও নেই। আমরা আমাদের আলোচনায় স্থানীয় সরকার নিয়ে যত কথাই বলি না কেন তার কোন সাংবিধানিক ভিত্তি নেই। কারণ সংবিধানে উৎকীর্ণ চারটি উদ্বৃত করা অনুচ্ছেদসমূহে ছয়টি বার 'স্থানীয় শাসন' ও 'প্রশাসন' শব্দাবলীই সংস্থাপিত রয়েছে। একটিবার কোথাও 'স্থানীয় সরকার' শব্দ উচ্চারিত হয়নি। সংবিধানের বাংলাভাষায় লিখিত অংশে 'স্থানীয় সরকার' শব্দ না থাকলেও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত অংশে স্থানীয় শাসনকে Local Government অনুবাদ করা হয়েছে। যা বাংলা ভাষার প্রচলিত পরিভাষা অনুযায়ী যথার্থ নয়। স্থানীয় শাসনের সঠিক অনুবাদ Local administration বা প্রয়োগভেদে Local rule হতে পারে, Local government কোনভাবে হতে পারে না। যেহেতু সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদের শেষাংশ বলা হয়েছে যে, "বাংলা ও ইংরাজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।" এখন অবশ্যই স্থানীয় শাসন ও Local government এর মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। কারণ স্থানীয় পরিষদের নামে পাশ করা বিভিন্ন আইন (উপজেলা আইন ১৯৯৮, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম পরিষদ আইন প্রভৃতি) মূলতঃ স্থানীয় শাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রণীত হয়েছে। শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের ধারণা বাস্তবক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাই সংবিধানের বাংলা অংশে 'স্থানীয় শাসনের' বদলে 'স্থানীয় সরকার' প্রতিস্থাপন করতে হবে। নতুবা সংবিধানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কোন ভিত্তিই পাওয়া যাবে না।

সংবিধানের এই চারটি অনুচ্ছেদ মনযোগ সহকারে পড়লে দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকারের গ্যারান্টি যা আছে তাও পুরোমাত্রায় জাতীয় সংসদের উপর ছেড়ে দেয়া

হয়েছে। সংবিধান স্থানীয় সরকারকে সাংবিধানিকভাবে স্থায়ী কোন গ্যারান্টি দেয়নি। প্রশাসনিক একাংশ যেহেতু সংবিধানে নির্দিষ্ট নেই তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এ ক্ষেত্রে যা খুশী করতে পারেন। বর্তমানে প্রশাসনিক একাংশ ও স্থানীয় সরকারকে সমান্তরাল করাটাই স্থানীয় সরকারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সংবিধানের এই বিশেষ অনুচ্ছেদসমূহ পুন পর্যালোচনা (Review) অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

স্তর সমস্যা

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে প্রশাসনিক পদ সোপানের অনুরূপ উপর নীচ স্তর কাঠামোতে আনা অপ্রয়োজনীয়। বর্তমানে প্রতিশ্রুত চার স্তর বিশিষ্ট কাঠামো সত্যিকার অর্থে পুরোপুরি কার্যকর করা কখনও সম্ভব হবে না। করলেও তাতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা দক্ষতা কমবে এবং আর্থিক অপচয় বাড়বে মাত্র। তাছাড়া কাঠামোগত জটিলতা প্রশাসনিকভাবেও পুরো ব্যবস্থাটিকে অকার্যকর করে দেবে। ছক-৪ থেকে বর্তমানকার স্থানীয় কাঠামোর জটিলতা অনুধাবনের একটি প্রয়াস নেয়া যেতে পারে।

তাই স্তর ও কাঠামোকে সহজ করার জন্যে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারকে সর্বাধিক দুই স্তরে সীমাবদ্ধ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। সেই দু'টি স্তর হওয়া উচিত উপজেলা ও ইউনিয়ন। গ্রাম, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের প্রয়োজন নেই। এমনকি প্রশাসনিক একাংশ হিসাবেও বিভাগের সম্পূর্ণ বিলুপ্তিই কাম্য। জেলায় কোন স্থানীয় সরকারের প্রয়োজন নেই। জেলাকে স্থানীয় সরকারের পরিবর্তে শক্তিশালী মাঠ প্রশাসনের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে গড়ে তোলা উচিত। বিষয়টি পূর্ববর্তী মাঠ প্রশাসন অংশে আলোচিত হয়েছে।

ছক-৪ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো

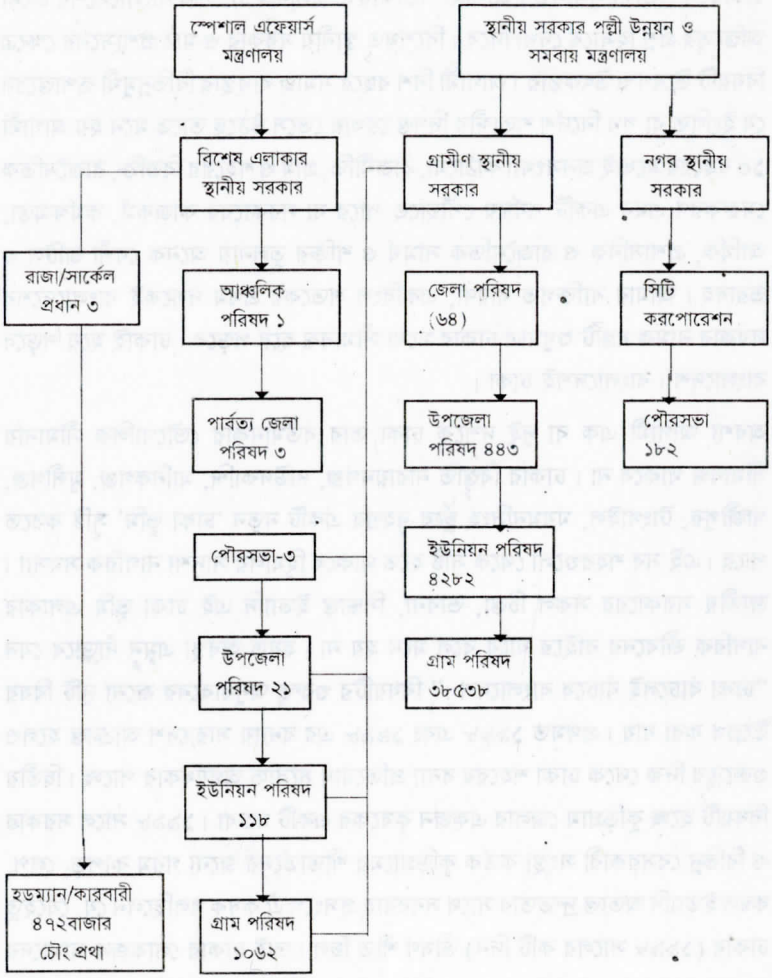

উৎস ঃ আহমেদ, তোফায়েল (১৯৯৮)।

একবিংশ শতকে বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার

একবিংশ শতাব্দী সমাগত। আগামী শতাব্দীর প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের জন্যে অস্তিত্বের প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিবে। বিশেষত স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিষয়টি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। আগামী বিশ বছরে সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্নমুখী রূপান্তরের যে ইংগিত বা পথ নির্দেশ শতাব্দীর দিগন্ত রেখায় ভেসে উঠছে তাতে মনে হয় আগামী ১০ বছরের মধ্যেই জনসংখ্যা কাঠামো, রাজনীতি, গ্রাম ও শহরের বিভক্তি, রাজনৈতিক মেরুকরণ এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যা সরকারের কাজকর্ম, কর্মক্ষমতা, আর্থিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সামর্থ ও শক্তির তুলনায় অনেক বেশী জটিল ও ভয়াবহ। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, একবিংশ শতকের প্রথম দশকেই বাংলাদেশের সরকার নামক যন্ত্রটি শুধুমাত্র ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। ঢাকাই হয়ে পড়বে বাংলাদেশ। বাংলাদেশই ঢাকা।

অবশ্য আগামী এক বা দুই দশকে ঢাকা তার বর্তমানকার ভৌগোলিক সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। ঢাকার বিস্তৃতি নারায়নগঞ্জ, দাউদকান্দি, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, টাংগাইল, ময়মনসিংহ ছুঁয়ে বৃহত্তর একটি নতুন 'ঢাকা ভূমি' সৃষ্টি করতে পারে। এই সব শহরগুলো থেকে সৃষ্টি হতে থাকবে হিমালয় সাদৃশ্য নাগরিক সমস্যা। জাতীয় সরকারের সকল চিন্তা, ভাবনা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি এই ঢাকা ভূমি এলাকার নাগরিক জীবনের বাইরে যাবে বলে মনে হয় না। হয়ত অবস্থা এমন দাঁড়াবে যেন "ঢাকা বাঁচলেই বাঁচবে বাংলাদেশ।" বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনের জন্যে দুটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। প্রথমত ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ এর বন্যায় সারাদেশ আক্রান্ত হলেও গুরুত্বের দিক থেকে ঢাকা শহরের বন্যা প্রতিরোধ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে কুড়িগ্রাম জেলার একজন কৃষকের একটি মন্তব্য। ১৯৯৮ সালে সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা কর্তক কুড়িগ্রামের শীতার্তদের জন্যে গরম কাপড়, লেপ, কম্বল ইত্যাদি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সরবরাহ প্রসংগে ঐ কৃষক বলছিলেন যে, যেহেতু ঢাকায় (১৯৯৮ সালের কটি দিন) ভীষণ শীত ছিল। তাই ঢাকার লোকজন আমাদের কথা মনে করেছে। ঢাকার আবহাওয়া উষ্ণ থাকলে কুঁড়িগ্রামে যতই শীত পড়ুক সাহায্য সামগ্রী এত তাড়াতাড়ি কুঁড়িগ্রামে পৌঁছাত না।

বর্তমানকার বিরাজিত জনসংখ্যা কাঠামোয় বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রতি ৫ জনের ৪জনই গ্রামীণ জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। আগামী শতাব্দীতে অর্থনীতির গতি প্রকৃতি ও জীবনজীবিকার বর্তমান কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হবে। গ্রামের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি জমির মাথাপিছু মালিকানা ১৯৮০ এর দশকেও যা ছিল ০.১০

হেক্টর, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষি ভূমির অন্যান্য ব্যবহার বিশেষতঃ শিল্প, গৃহায়ন, সড়ক, নদীভাঙ্গন প্রভৃতির কারণে তাও ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। কর্মহীন দরিদ্র মানুষগুলো অধিক হারে তাই শহরমুখী হতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া ইতিমধ্যে শহরাঞ্চলে নগর দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের ব্যাপক প্রসার ও বিস্তৃতি দেখা যাচ্ছে। অনেক বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) যারা ইতোপূর্বে গ্রামীণ দরিদ্র্য পুরুষ মহিলাকে নিয়ে নানা কাজ করতো তারা এখন অনেকেই শহরাঞ্চলে তাদের কর্মকান্ডকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পয়নিস্কাশন, ক্ষুদ্র ঋণ, শিশু উন্নয়ন ও জেন্ডার উন্নয়ন, মানবাধিকার ইত্যাদি কার্যক্রমে বস্তিবাসীরা গ্রামীণ দরিদ্র্যদের তুলনায় অনেক বেশী মনযোগ পাচ্ছেন। তাতে গ্রামের দরিদ্রগণ স্বাভাবিকভাবেই একে অপরের হাত ধরে শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ঢাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এতে বেশ সহায়কই হচ্ছে। গ্রামে এনজিওদের বিনিয়োগ ও কার্যক্রম ১৯৯০ এর পর থেকে হ্রাস পাচ্ছে বলেই আমার ব্যক্তিগত ধারণা। হ্রাস না পেলেও যে বাড়ছে না, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

তাছাড়া চাকুরী, ব্যবসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সর্বক্ষেত্রে ঢাকাই এক মাত্র ভরসা স্থল হওয়ায় অন্যান্য ছোট বড় সকল শহরের বিত্তবান এমন কি মধ্যবিত্তরাও ঢাকামুখী। এমন কি চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী প্রভৃতি শহরগুলো ঐ সব শহরে বসবাসকারী বিত্তবানদের বিভিন্ন চাহিদা মিটাতে সক্ষম নয় বা তাদের ঐ শহরগুলো আর ধরে রাখতে পারছে না। তবে এখানে চাহিদা অর্থে বিলাস সামগ্রীর অভাবকে বুঝানো হচ্ছে না। ন্যূনতম মৌলিক গুণ মানসম্পন্ন সেবাসমূহ, যেমন চিকিৎসা ও শিক্ষার অবকাঠামো ঐ সব শহরগুলোতে অনুপস্থিত। তাই বিত্তবানরা বা ক্ষমতাশালীগণ ঢাকাকে তাদের বাঁচার অবলম্বন মনে করেই এদিকে ধাবিত হচ্ছেন।[৩৪]

সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিবিদ ও জনমিতি বিশেষজ্ঞদের যে ধারণা তাতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০২০ সাল নাগাদ বর্তমান প্রবৃদ্ধির আলোকে ১৮ থেকে ২০ কোটিতে বৃদ্ধি পেতে পারে। এই ১৮/২০ কোটির মধ্যে ৮ কোটিই নগরের বাসিন্দা হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। দেশের ছোট, মাঝারী ও বড় শহরগুলোতে এরা ছড়িয়ে থাকলেও এককভাবে ঢাকা শহর ৮ কোটি নগরবাসীর মধ্যে ২ কোটির বাসস্থান-কর্মস্থান হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষতঃ ঢাকার এই ব্যাপক স্ফীতি বাংলাদেশের রাষ্ট্র, রাজনীতি, প্রশাসন, উন্নয়ন ও সেবার সকল কাঠামো অবকাঠামোর খোলনলচে পাল্টে দেবে ধারণা করা হচ্ছে। প্রথমতঃ ঢাকা শহরের ঐ দুই কোটি এবং বৃহত্তর ঢাকা

ভূমির আরও দুই কোটি মানুষের সমস্যা সরকারকে এত বেশী ব্যস্ত ও বিব্রত রাখবে যে, ঢাকার বাইরে সরকারের কর্মকান্ড ও রাজনীতি খুব একটা যেতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের তুলনায় নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়বে। ধীরে ধীরে গ্রাম এলাকা শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি সীমার বাইরেই চলে যাবে। তৃতীয়তঃ সামগ্রিকভাবে পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি খাতে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পাবে। তাতে গ্রাম এলাকায় উন্নয়ন ও বিনিয়োগ স্বাভাবিকভাবেই নিরুৎসাহিত হবে। চতুর্থতঃ পুল এবং পুশ দুই কারণে মেধা পাচারের ফলে গ্রামাঞ্চলে নেতৃত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতার সামগ্রিক দৈন্য বৃদ্ধি পেয়ে একটি অকল্পনীয় অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা রাজশাহী ছাড়াও দেশের অন্যান্য শহরগুলোতেও ব্যাপক হারে নাগরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। চাপ বাড়বে সীমাবদ্ধ সম্পদের উপর। তাই সারা দেশে নগর ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক সেবা বা পৌর সেবা বজায় রাখা দুষ্কর হবে। পৌর এলাকার বাসিন্দাগণ স্বাভাবিকভাবে গ্রামীণ জনসমাজের তুলনায় বেশী রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এভাবেই গ্রামগুলো ব্যাপকভাবে অবহেলিত বা সরকারের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতে পারে। এমনকি বর্তমান সময়েও (১৯৯৯) স্থানীয় সরকারের জন্যে বরাদ্দ সরকারী অনুদানের সোজাসুজি তিন চতুর্থাংশ নগর স্থানীয় সরকারের জন্যে ব্যয় হয়। ভবিষ্যতে আগামী দশ বছরে নগরের সেবা চাহিদা আরও অন্ততঃ দশগুণ বৃদ্ধি পাবে।[৩৫] তখনকার অবস্থায় গ্রামীণ বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসন এবং গ্রামীণ স্থানীয় সরকারকে কিভাবে কার্যকর রাখা সম্ভব তা এখনই চিন্তা করা দরকার। তাই এই লক্ষ্যে এখন থেকেই গ্রামীণ স্থানীয় সরকার বিশেষতঃ ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালীকরণ, দেশে অহেতুক রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের জন্যে বিভিন্ন থানার কেন্দ্রে বাজারকেন্দ্রিক পৌরসভা সংখ্যা বৃদ্ধি করে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি না করে জেলা সদর, শিল্প এলাকা, বন্দর এলাকা এবং বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে পৌর সরকারকে শক্তিশালী করা উচিত। থানা কেন্দ্রিক একটি নতুন পৌরসভা শুরু করতে সরকারের প্রায় ৩০ লাখ টাকা এককালীন এবং প্রতি বছর আরও গড়ে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। অথচ থানা সদরের ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সে বিপুল খরচ সাশ্রয় করে সকল ইউনিয়ন পরিষদগুলোকেই সহায়তা করা যায়। জেলা পর্যায়ে গড়ে তোলা উচিৎ শক্তিশালী সমন্বিত এবং প্রশাসনিক ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা কাঠামো। তাছাড়া শিল্প, ব্যবসা, সেবা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন) প্রভৃতির ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার। তাই বিকেন্দ্রীকরণ শুধু স্থানীয় সরকার সৃষ্টিতে

সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। সরকারী মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ইত্যাদির সংখ্যা কমিয়ে ঢাকা কেন্দ্রিক মাথাভারী জনবল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোকে কেটে ছেটে এক তৃতীয়াংশ করে যায়। মাঠ পর্যায়ে জনবল, ক্ষমতা, অর্থ ও দক্ষতাকে বিস্তার করে দিতে হবে। একুশ শতকের জনপ্রশাসন সংস্কার চিন্তাকে তাই ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ, ঢাকা বিমুখী এবং মাঠ প্রশাসন ও উন্নয়ন চিন্তায় সংস্থাপিত করতে হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

১. আধুনিক রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে যে শ্রেণী বা শ্রেণীসমুহ রাষ্ট্রকে অধিকার করে আছে সে অধিপতি শ্রেণী বা রাষ্ট্রীয় অভিজনদের পুঁজি আহরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাপক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সামসাময়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণীমূলক একটি মনোজ্ঞ আলোচনার জন্য দেখুন Tofail Ahmed, Decentralization and the Local State Under Perepheral Capitalism, Dhaka, Academic Publishers, 1993, PP-52-117.

২. T. B. Bottomore,(1975) Sociology : A Guide to Problems and Literature, Unwin University Books, London, 1975 (3rd ed), PP-151-167.

৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ ও রাজনীতি শীর্ষক একটি ধারাবাহিক রচনা (প্রতি বুধবার প্রকাশিত হয়) ১৯৯৮-১৯৯৯, দৈনিক সংবাদ।

৪. অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, বাংলাদেশের লোক প্রশাসন ঃ তত্ত্ব ও তথ্য, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, বাংলাদেশের লোক প্রশাসন (অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান সম্পাদিত) পৃষ্ঠা-১-৪৪ (১৯৮২)।

৫. History of Bengal Vol.-I University of Dhaka, 1976 এবং মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত।

৬. ষষ্ঠ শতকে বাংলাদেশ দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে কিছু স্বাধীন রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বাধীন রাজাদের পর পালরা প্রায় ৪০০ বছর শাসন পরিচালনা করে। পালদের পর আসে সেন বংশ।

৭. বাংলাদেশের দুই দশকের প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত বিভিন্ন কমিটি/কমিশনের একটি তালিকার জন্যে দেখুন Musleh Uddin Ahmed, Redesigning of Public Administration System in a Developing Country : The Case of Bangladesh Administrative Reform from 1971 to 1995, Social Science Review (SSR) Vol-XIII No.2 (1996) PP47-66.

৮. বিশ্বব্যাংক, দক্ষ সরকারে রূপরেখা ১৯৯৬, ঢাকা।

৯. প্যারিসের এইড কনসোর্টিয়াম সভায় পেশ করার জন্যে UNDP কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ Country paper দেখুন ১৯৯৭ এবং ১৯৯৮।

১০. বাংলাদেশের সরকারের গেজেট (অতিরিক্ত) নভেম্বর ৭, ১৯৯৭।

১১. Tofail Ahmed, 1993 দেখুন।

১২. Philip Mawhood, Shabbier Cheema and D. A. Rondinnely এবং Norman Uphalf এর সংশ্লিষ্ট রচনার গুলোর বিস্তারিত আলোচনার জন্যে Tofail Ahmed (1993),প্রাগুক্ত দেখুন পৃষ্ঠা ২৮-৩২।

১৩. A.M. M. Sawkat Ali. Field Administration and Rural Development in Bangladesh Dhaka, Center for Social Studies, 1982.পরবর্তীতে Rear Admiral M. A. Khan (Khan Commiittte) এর সভাপতিত্বে গঠিত The Committee of Administrative Reorganisation/ Reform, 1982 এর প্রতিবেদনে মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত দেখুন পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪।

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা-১

১৬. Nazmul Abedin, Local Administration and Politics in Modernizing Societies Bangladesh and Pakistan, NIPA, Dhaka, 1973.

১৭. Administration and Services Reorganization Committee 1973 (Chairman, Professor Muzaffar Ahmed Chowdhury).

১৮. Committee for Administrative Reorganization /Reform 1982 (Chairman) Rear Admiral M. A. Khan).

১৯. ২৪শে নভেম্বর ১৯৯১ইং সনে প্রথম ১৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। পরে এ সংখ্যাকে ১৭ এ উন্নীতে করা হয়। কমিশন ৩০-০৭-৯২ইং তারিখে ৬২ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।

২০. ১৯৯১ইং সনের ১লা সেপ্টেম্বর স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত হয়। কমিশনে চারজন সংসদ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার মধ্যে বি.এন.পির সংসদ কমিশনের কাজে অংশগ্রহণ করেননি। আট মাস কাজ করে কমিশন ১৯৯২ সনের মে মাসে ৩৪ পৃষ্ঠার ৭টি পরিশিষ্ট ও ২৪ পৃষ্ঠার সার সংক্ষেপ ছাড়া ৭৩ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন।

২১. তোফায়েল আহমেদ ও আবদুল কাদের, স্থানীয় সরকারের যুগসন্ধিক্ষণ ঃ কাঠামো কার্যগত সংস্কারের আলোকে কিছু সুপারিশ, বার্ড, কুমিল্লা ১৯৯২। এই পুস্তিকায় গবেষণাভিত্তিকি অনেক সুপারিশ সন্নিবেশিত হয়। যা পরবর্তীতে হুদা কমিশন ও রহমত আলী কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়।

২২. তোফায়েল আহমেদ ও আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, দেখুন।

২৩. তোফায়েল আহমেদ, স্থানীয় সরকারের সংস্কার ভাবনার দুই দশক, কোষ্ট ট্রাস্ট, ভোলা, ১৯৯৮।

২৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (৩০ জুন ১৯৯৪ পর্যন্ত সংশোধিত) দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ ২২ ("রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।")

২৫. বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৩, ১৯৯৮। ১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন।

২৬. ঐ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তফশীল দেখুন।

২৭. উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮, ধারা ২৫।

২৮ উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮, এর ৯, ১৩৪, (২) (৩), ১৮, ২০, (২), ২৩ (২), ২৪(৩) ২৬(২)(৪), ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৮(২), ৩৯(১) ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৬৫, ধারা উপধারা সমূহ পর্যালোচনা করে দেখুন। ভবিষ্যতে উপজেলা বিধি প্রণীত হলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

২৯. তোফায়েল আহমেদ, ১৯৯৮, প্রাগুক্ত দেখুন।

৩০. Tofail Ahmed and M. Nurul Islam, Decentralized District Planning A Framework for Action, 1995 (স্থানীয় সরকারের সংস্কার ভাবনার দুই দশক) পৃষ্ঠা ১৪১-১৬০.

৩১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৯৪) পৃঃ ৯ এবং ৪৩।

৩২. ঐ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-১৩৫।

৩৩. World Bank and Center for Advance Studies (1998) Bangladesh : 2020, UPL, Dhaka P-60.

৩৪. World Bank and Center for Advanced Studies (1998), প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৪২।

৩৫ Tofail Ahmed, Local Government for the Next Millennium : Bangladesh perspective, Awaith Publication (1999).